

হুগলী প্রাথমিক শিক্ষক বিদ্যালয়



গর্‌মিল

শ্রীনরেন্দ্র দেব

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

ভাদ্র—১৩৩২

দেড় টাকা

প্রকাশক —
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঙার
ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

উপহার

পূজনীয়া

শ্রীযুক্তা সরলা সুন্দরী ঘোষ

c/o. বাবু আশুতোষ ঘোষ

হরিশ চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট

ভবানীপুর।

শ্রীচরণেষু

দিদি, কিশোর বয়স থেকেই তোমার উপন্যাস পড়বার প্রবল ঝোঁক ছিল ব'লে তুমি অনেকগুলো লাইব্রেরীর মেম্বার হ'য়েছিলে। ইস্কুল থেকে এসে আমার একটা প্রধান কাজই ছিল লাইব্রেরী থেকে তোমার বই বদ্‌লে নিয়ে আসা। তোমার নাম ক'রে আনা উপন্যাসগুলি লুকিয়ে প'ড়ে ফেলবার সুযোগ পেতুম বলে, লাইব্রেরী থেকে বই বদ্‌লে আন্‌বার চাড়টা তোমার চেয়ে আমারই ছিল বেশী! তুমি মাতাজীর মহাকালী পাঠশালায় প'ড়ে বাঙ্‌লা আর সংস্কৃত শিখেছিলে, ইংরাজী শেখবার সুযোগ পাওনি, তাই আমি যখন উঁচুক্লাশে উঠে ইংরাজী উপন্যাসও এনে প'ড়তে লাগলুম, তুমি শুধু আমার পড়বার টেবিলের কাছে এসে, বই গুলোর মলাটের উপর হাত বুলিয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে চলে যেতে! তোমার সে দুঃখ আমি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করতুম, তাই সেই অল্পবয়সে পঠদ্দশাতেই আমি মনে মনে পণ করেছিলেম যে, এরপর বড় হ'লে যদি সুযোগ পাই তোমাদের জন্য য়ুরোপীয়

পূজনীয়া

শ্রীযুক্তা সরলা সুন্দরী ঘোষ

c/o. বাবু আশুতোষ ঘোষ

হরিশ চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট

ভবানীপুর।

শ্রীচরণেষু

দিদি, কিশোর বয়স থেকেই তোমার উপন্যাস পড়বার প্রবল ঝোঁক ছিল ব'লে তুমি অনেকগুলো লাইব্রেরীর মেম্বার হ'য়েছিলে। ইস্কুল থেকে এসে আমার একটা প্রধান কাজই ছিল লাইব্রেরী থেকে তোমার বই বদ্‌লে নিয়ে আসা। তোমার নাম ক'রে আনা উপন্যাসগুলি লুকিয়ে প'ড়ে ফেলবার সুযোগ পেতুম বলে, লাইব্রেরী থেকে বই বদ্‌লে আন্‌বার চাড়টা তোমার চেয়ে আমারই ছিল বেশী! তুমি মাতাজীর মহাকালী পাঠশালায় প'ড়ে বাঙ্‌লা আর সংস্কৃত শিখেছিলে, ইংরাজী শেখবার সুযোগ পাওনি, তাই আমি যখন উঁচুক্লাশে উঠে ইংরাজী উপন্যাসও এনে প'ড়তে লাগলুম, তুমি শুধু আমার পড়বার টেবিলের কাছে এসে বই গুলোর মলাটের উপর হাত বুলিয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে চলে যেতে! তোমার সে দুঃখ আমি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করতুম, তাই সেই অল্পবয়সে পঠদ্দশাতেই আমি মনে মনে পণ করেছিলেম যে, এরপর বড় হ'লে যদি সুযোগ পাই তোমাদের জন্য য়ুরোপীয়

উৎকৃষ্ট উপন্যাস ও নাটকগুলির বাঙ্‌লা করবার চেষ্টা ক'রবো !—এখানা তারই প্রথম চেষ্টা—তাই তোমারই হাতে কৃতাঞ্জলিপুটে তুলে দিলুম।

বেয়র্ণষ্ট্যার্ণ্‌ বেয়র্ণ্‌সন্‌ (Bjornstjerne Bjornson) নরওয়ে দেশের একজন বিখ্যাত কবি, নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক ছিলেন। ইনিই সর্ব্বপ্রথম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচনার জন্য "নোবেল প্রাইজ্‌" পেয়েছিলেন। এঁরই "নববিবাহিত দম্পতী" (De Nygifte or The Newly married couple) শীর্ষক নাটিকা অবলম্বনে আমার এই উপন্যাসখানি রচিত। ইংরাজী নাম ধাম তোমাদের ভাল লাগ্‌বেনা জেনেই আমি একে যতটা সম্ভব দেশী ছাঁচেই গড়েছি ভাই, তবে মাঝে মাঝে বিলাতীর গন্ধ একেবারে ঢাকতে পারিনে, সেটাকে তোমরা আমার অক্ষমতাও বলতে পারো অথবা সবটাই ঢাকা দেওয়া সম্ভবপর নয়—এটাও মনে করতে পারো ! যাই হোক্‌ এ বই খানা যদি তোমাদের ভাল লাগে—তাহ'লে খুসী হ'য়ে আবার একখানা ধরা যাবে, নইলে 'পণ-রক্ষা' এই পর্য্যন্তই দিদি ! ইতি—

৩, মুক্তারাম রো
কলিকাতা।
২রা শ্রাবণ, ১৩৩২

তোমার চির-স্নেহ-ধন্য অনুজ
প্রণত
নরেন

গরমিল

প্রথম অংশ

পূর্ব্বাভাষ

রায়বাহাদুর মুকুন্দ মজুমদার অনেক দিন হইল জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটী কাজে অবসর লইয়াছেন। কলিকাতার নিকটস্থ রাজনগরে তাঁহার কিছু পৈতৃক জমীদারী ছিল। হাকিমী কাজে যথেষ্ট নগদ টাকা উপার্জ্জন করিয়া তিনি সেইখানেই আসিয়া দস্তুরমত সাহেবী চালে বাস করিতেছিলেন।

পরিবারের মধ্যে তাঁহার পুত্রশোকাতুরা পত্নী কল্যাণী, সদ্য-বিধবা পুত্রবধূ কমলা ও নব-বিবাহিতা কন্যা লীলা। একমাত্র পুত্র শশাঙ্কসুন্দর বিবাহের অল্প দিন পরেই তিন দিনের সামান্য জ্বরে মজুমদার পরিবারকে বজ্রাহত করিয়া চলিয়া গিয়াছে। কমলার রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া শশাঙ্ক তাহাকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছিল। সে দরিদ্রা পিতৃমাতৃহীনা জানিয়াও পিতামাতার

ইচ্ছার বিরুদ্ধে শশাঙ্ক তাহাকে বিবাহ করিয়া আনিতে একটুও ইতস্ততঃ করে নাই। পত্নীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া, ও একমাত্র পুত্রটী পাছে অসুখী হয় এই আশঙ্কায়, রায় বাহাদুরও শেষ পর্য্যন্ত এ বিবাহে তেমন জোর-আপত্তি করিতে পারেন নাই।

কমলা মজুমদার-গৃহে আসিয়া অতি অল্প দিনের মধ্যেই স্বামীর সকল আত্মীয়কেই নিজ-গুণে আপন করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু জনমদুঃখিনী অনাথা তাহার ললাট-লিখিত দুর্ভাগ্যকে অতিক্রম করিতে পারে নাই, বৎসর না ফিরিতেই স্বামীকে হারাইয়াছে। কল্যাণী ও মুকুন্দবাবু এই গুণবতী পুত্রবধূকে লইয়া একমাত্র পুত্রের অভাব-বেদনা যেন কতকটা ভুলিয়াছিলেন। তার পর, এই সেদিন লীলা যখন নরেশকে বরণ করিল এবং রায় বাহাদুর তাহাকে স্বর্গগত পুত্রের স্থলাভিষিক্ত করিয়া আপন গৃহেই চিরদিন রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া ফেলিলেন, শশাঙ্কর মৃত্যু জনিত এই শোকার্ত্ত পরিবার অনেক দিনের পরে আবার যেন একটু সুস্থ হইয়া উঠিল।

১

লীলার বিবাহের এখনও এক বৎসর পূর্ণ হয় নাই। রায় বাহাদুর মুকুন্দ মজুমদার সেদিন সকালে একটি আপাদলম্বিত ড্রেসিং-গাউনে আবৃত হইয়া তাঁহার ড্রয়িং-রুমের একখানি আরাম-চৌকীতে হেলান দিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন।

নরেশ ঘরে ঢুকিয়া শ্বশুরের পাশের চায়ের টেবিলটার দিকে চাহিয়াই বলিয়া উঠিল "যাক্, বড় বেঁচে গেছি, আজ যখন চা আসেনি এখনও, তখন নিশ্চয়ই আমার উঠ্‌তে বেশী দেরী হয়নি!"

মজুমদার সাহেব খবরের কাগজ হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া নরেশের দিকে চাহিবামাত্র শিহরিয়া উঠিলেন। নরেশ তাহা দেখিয়া শশব্যস্তে শ্বশুরের নিকট সরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "ব্যাপার কি? আজ কি কাগজে কিছু ভয়ানক খবর বেরিয়েছে?"

মজুমদার সাহেব জামাতার পোষাকের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন "এই দারুণ শীতে তুমি কেবল একটা ফ্লানেলের সার্ট গায়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লে কি ব'লে? তোমরা ছেলে-ছোকরার দল শরীর সম্বন্ধে বড়ই অসাবধানী! এখনি

হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে জানো? যাও, যাও, শিগ্‌গীর তোমার ওভারকোটটা গায়ে দিয়ে এসো।"

নরেশ শান্ত বালকের মতো তৎক্ষণাৎ ভিতরে গিয়া ওভার-কোটটী পরিয়া আসিল।

মজুমদার সাহেব একটা মোটা চুরুট ধরাইয়া বলিতে লাগিলেন "দেখ নরেশ, ওই কোরেই সে ছোঁড়াটা বাঁচ্‌লো না। সকালে রোজ ঘর থেকে বার হবার সময় কিছু না পাও তো অন্ততঃ বিছানার চাদরখানাও গায়ে জড়িয়ে তবে বাইরে বেরোবে। খবর্দ্দার যেন হঠাৎ ঠাণ্ডা না লাগে।"

নরেশ সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া বলিল "যে আজ্ঞে, এবার থেকে তাই কোরবো।"

চায়ের সরঞ্জাম সমেত একখানি ট্রে হাতে করিয়া কমলা এবং তাহার পশ্চাতে একখানি রেশমী পাড়-বসানো খয়েরি রংয়ের আলোয়ানে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া কল্যাণী ঘরে আসিবামাত্র মজুমদার সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন "লীলার কি হোলো? সে আজ এখনও ওঠেনি কেন?"

"এই যে বাবা আমি উঠেছি—! আমার আল্‌ষ্টারটা খুঁজে পাচ্ছিনি, তাই ঘর থেকে বেরোতে পার্‌ছিনি।—এই যে পেয়েছি—" বলিতে বলিতে একটা চমৎকার লেডীজ্ আল্‌ষ্টার্ হাতে করিয়াই তরুণী কুরঙ্গিণী প্রায় লীলা আসিয়া উপস্থিত

হইল। নরেশ তখন শ্বশুরের পরিত্যক্ত খবরের কাগজখানা একমনে পড়িতে সুরু করিয়াছে।

কমলা চায়ের টেবিলের উপর ট্রে'খানি গুছাইয়া রাখিয়া চলিয়া গেল, যেন প্রভাত সমীরে দোদুল নিটোল পদ্মটির মতো!

কল্যাণী মেয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন "উঠ্‌তে এত বেলা করলি যে লিলি! কোন অসুখ বিসুখ করেনি তো?"

লীলা আল্‌ষ্টারটা পরিতে পরিতে মরাল গ্রীবাটি লীলায়িত ভঙ্গীতে সঞ্চালন করিয়া বলিল "না মা, রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি ব'লে, ভোরের দিকটায় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। তোমার কাশিটা একটু কমেছে কি?"

কল্যাণী ইহার কোনও উত্তর দিবার পূর্ব্বেই মজুমদার সাহেব বলিয়া উঠিলেন "তোমার মা'র শরীর বড়ই খারাপ, কাল রাত্রে খুবই কেশেছেন। আমি ডাক্তার চাটার্জ্জীকে আসবার জন্যে লিখে পাঠিয়েছি।" পত্নীর দিকে চাহিয়া বলিলেন "ডাক্তার এলে লিলিকেও একবার দেখে যেতে বোলো। রাত্রে ভাল ঘুম হয় না বল্‌ছে, ওটা তো ভাল কথা নয়।"

লীলা চায়ের পেয়ালাগুলি ভর্ত্তি করিয়া সবার হাতে একটী একটী তুলিয়া দিল, কেবল নরেশের বাটিটা টেবিলের উপরই একটু নরেশের দিকে ঠেলিয়া রাখিয়া, নিজের জন্য এক পেয়ালা হাতে লইয়া মা'র পাশে একখানি সোফায় আসিয়া বসিল।

কল্যাণী চায়ের বাটিতে চুমুক দিতে দিতে বলিলেন "লিলি, আমি বোধ হয় আজ চারুদের ওখানে নিমন্ত্রণে যেতে পারবো না!"

লীলা ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কেন মা! শরীরটা কি আজ বড্ড খারাপ বোধ হচ্ছে!"

মজুমদার সাহেব চামচে দিয়া চায়ের পেয়ালার চিনিটুকু নাড়িয়া লইয়া বলিলেন "এইমাত্র আমার কাছে শুন্‌লে তো লিলি, যে কাল সমস্ত রাত উনি কেশেছেন, তবু আবার—"

কল্যাণী বাধা দিয়া কহিলেন "সমস্ত রাত বোলো না, মোটে দু'বার তো কেশেছিলুম।" বলিতে বলিতে কল্যাণী কাশিয়া উঠিলেন।

মজুমদার সাহেব তাড়াতাড়ি একঢোঁক চা গলাধঃকরণ করিয়া বলিলেন "ওই দেখ ,এখনও কাশছো, আর বল্‌ছো মোটে দুবার! এই ঠাণ্ডায় রাত্রে তোমার কিছুতেই নিমন্ত্রণ যাওয়া হ'তে পারে না।"

লীলা চায়ের পেয়ালাটি নিঃশেষ করিয়া বলিল "মা'র যখন এত অসুখ, তখন আমরাও কেউ আর নেমন্তন্নে যাবো না।"

লীলার এই কথা শুনিয়া মজুমদার সাহেব উৎসাহিত হইয়া বলিলেন "সেই ভালো, এই হিমে তোমাদেরও আর গিয়ে কাজ নেই, সময়টা বড় খারাপ, চারিদিকে অসুখ-বিসুখ হচ্ছে।"

কল্যাণী তাড়াতাড়ি বলিলেন "না না, সেটা ভালো দেখায় না। দেখ, চারু এসে অমন কোরে সকলকে যাবার জন্য ব'লে গেছে— কেউ না গেলে সে কি মনে করবে? কি বল' নরেশ?—

নরেশ খবরের কাগজখানি ভাঁজ করিয়া টেবিলের উপর রাখিল; নিঃশেষিত চায়ের পেয়ালাটি তাহার উপর চাপাইয়া দিয়া বলিল "আমিও ওই কথাই বোল্‌বো মনে করছিলুম। কারুর না যাওয়াটা একটু অভদ্রতা হবে।"

মজুমদার সাহেব বলিলেন "তাতে আর কি হ'য়েছে, একখানা চিঠি লিখে তাকে আগে থাক্‌তে খবর দাও না যে তোমরা কেউ যেতে পার্‌বে না।"

নরেশ যেন একটু কুণ্ঠিত হইয়া বলিল "হ্যাঁ, তা'করলেও হয় বটে, কিন্তু কারুর একেবারে না যাওয়াটা কি ভালো দেখাবে?—"

লীলা তাহার পিতার দিকে চাহিয়া বলিল "মা'র অসুখের কথা লিখে দিলে তাঁরা বোধ হয় কিছু মনে ক'রবেন না, কি বল বাবা?"

নরেশ তখন শাশুড়ীর দিকে ফিরিয়া বলিল "আপনি জানেন তো মা, চারু আমাদের বিয়ের সময় এখানে ছিল না। আমেরিকা থেকে এসে যেদিন শুনেছে, সেই দিন থেকেই আমাদের একদিন নিয়ে গিয়ে আমোদ ক'রবে বল্‌ছে।

আজকে সে যখন তার সমস্ত আয়োজন করেছে, নিজে স্ত্রীকে সঙ্গে করে এসে আমাদের সকলকে যাবার জন্য বিশেষ ক'রে ব'লে গেছে, তখন অন্ততঃ আমাদের দুজনের নিশ্চয়ই যাওয়া উচিত, কি বলুন ?"

কল্যাণী সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন "নিশ্চয়, কেন না তোমাদের দুজনের খাতিরেই সে আজ খরচপত্র ক'রে এই আয়োজন ক'র্ছে।"

লীলা অসহিষ্ণুর মত বলিয়া উঠিল "কিন্তু তুমি তো যেতে পারবে না মা! তোমার এই অসুখ শরীর; তোমাকে ফেলে রেখে আমি একলা সেখানে গিয়ে তো একটুও আমোদ পাবো না!"

ইহার উত্তরে গম্ভীর ভাবে নরেশ বলিল "আমোদ পাওয়া যায় না এমন অনেক কাজই সংসারে থাকতে হ'লে মানুষকে ক'রতে হয়।"

লীলা একবার চকিতে নরেশের দিকে চাহিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল "সে হয় কর্ত্তব্যের খাতিরে, কিন্তু এখানে আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য হচ্ছে মার ভাল-মন্দ দেখা। এই রোগা-মানুষকে একলা বাড়ীতে ফেলে রেখে আমি কি আমোদ ক'রতে যেতে পারি ?"

নরেশ একটু অপ্রতিভের মতো মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে

বলিল "কেন, বৌদি তো রয়েছেন, তিনিই তো সব দেখেন শোনেন—তিনি কি—"

বাধা দিয়া লীলা বলিল "মার প্রতি মেয়েরও তো একটা কর্ত্তব্য আছে। হাজার কেন যেই থাক না, তবু আমার কাজ তো আমাকে ক'রতে হবে। আমি বুড়ো মেয়ে, তাঁর এমন অসুখ দেখেও কি বলে সেজেগুজে নেমন্তন্ন খেতে যাবো ?"

নরেশ কাতরভাবে গৃহিণীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল "হ্যাঁ মা, আপনার কি বড্ড অসুখ ? আমি কিন্তু এতক্ষণ তা বুঝতে পারিনি !"

ইহার উত্তরে রায় বাহাদুর মুকুন্দ মজুমদার তাঁহার গম্ভীর কণ্ঠস্বর আরও গম্ভীরতর করিয়া বলিলেন "তুমি কি শুন্‌তে পাওনি নরেশ, আমি সকাল থেকে দশবার বলিছি যে ওঁর শরীর বড়ই খারাপ, কাল সমস্ত রাত কেশেছেন ?"

কর্ত্তার কণ্ঠস্বরে বিচলিত হইয়া কল্যাণী বলিলেন "আমি যে নিজে বলেছিলুম গো, যে মোটে বার-দুই কেশেছি,—তাই বোধ হয় নরেশ মনে করেছে আমার অসুখটা তেমন কিছু নয়" বলিতে বলিতে গৃহিণীর দৃষ্টি পড়িল জামাতার রুদ্ধরোষে আরক্ত ও অপমানে আহত অবনত মুখের উপর। তিনি বলিতে লাগিলেন "আর যথার্থই তো তাই! এমনিই বা কি অসুখ করেছে

আমার ? তোমাদের বাপু কেমন যেন বাড়াবাড়ি করাটা একটা স্বভাব ! একটু কেশেছি বই ত নয় !"

"কাশিটাকে সামান্য ব'লে অগ্রাহ্য করা ঠিক নয়" বলিয়া মজুমদার সাহেব খবরের কাগজখানা তুলিয়া লইয়া আবার পড়িতে সুরু করিলেন ; কিন্তু মুহূর্ত্ত পরে আবার সেখানি মুড়িয়া রাখিয়া—দুই একবার গলাটা ঝাড়িয়া লইয়া বলিলেন "আর কি জানো—কাল থেকে আমার নিজের শরীরটাও তত ভাল বোধ কর্‌ছিনে। কেমন যেন—"

ব্যস্ত হইয়া কল্যাণী বলিয়া উঠিলেন "তাইতো, তোমার গলাবন্ধটা তো আজ নাওনি দেখ্ছি ? দাঁতের গোড়াটা বোধ হয় কন্‌-কন্‌ করছে ! ও লিলি, যা মা, ওঁর গলাবন্ধটা ও ঘর থেকে শীগ্‌গির এনে দে।"

লীলা তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গিয়া গলাবন্ধটা লইয়া আসিল এবং অতি যত্নের সহিত পিতার কণ্ঠে জড়াইয়া দিতে লাগিল। কল্যাণী বলিতে লাগিলেন, "তাইতো বলি, আজ তুমি আমাদের কাগজ পড়ে' লড়াইয়ের কোনও খবর শোনালে না কেন ; আমি মনে করেছিলুম আজ বুঝি কাগজে তেমন নতুন খবর কিছু নেই।"

রায় বাহাদুর ডানদিকের দাঁতের গোড়াটায় হাত চাপা দিয়া অন্ধ নাচারের মতো কাতর কণ্ঠে বলিলেন "আজ নরেশ আমাদের

কাগজটা প'ড়ে শোনাক্; আমার শরীরটা তত ভাল নেই।"

নরেশ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "সে যেন শোনাচ্ছি, কিন্তু চারুর ওখানে নেমন্তন্নে যাবার কি হবে, তার তো একটা কিছু ঠিক হোলো না।"

লীলা এবার নরেশের দিকে একটু ভ্রূকুটি করিয়া মা'কে বলিল "আচ্ছা মা, উনি কেন একলাই নেমন্তন্ন রাখতে যান না।"

নরেশ তৎক্ষণাৎ চেয়ার সমেত গৃহিণীর নিকট আরও সরিয়া আসিয়া বলিল "দেখুন মা, এটা যদি অন্য কোনও একটা সামাজিক ব্যাপারের নেমন্তন্ন হোতো, তা হ'লে ওকে নিয়ে যাবার জন্যে আমার কোনই মাথাব্যথা ছিল না। আমি একলা গিয়েই স্বচ্ছন্দে নেমন্তন্ন রেখে আসতে পারতুম। কিন্তু, আপনি তো জানেন, কেবল ওকে নিয়ে যাবার জন্যেই সে এই আয়োজন করেছে। যার জন্যেই সব, তিনিই যেতে পারবেন না! এ সব ছেলেমানুষী কথা নয়?"

গৃহিণী ইহাতে সায় দিয়া বলিলেন "তা বই কি! নরেশ না গেলেও হয়ত' চোল্‌তো, কিন্তু তোমার না যাওয়াটা ভারি অন্যায় হবে লীলা।"

নরেশ উৎসাহিত হইয়া বলিল "সেই জন্যেই তো আমি এতটা

পেড়াপিড়ি করছি, নইলে আপনার অসুখ শুনেও আমি কি নেমন্তন্ন যাওয়ার কথাও মুখে আনতে পারতুম ?"

বিরক্ত হইয়া লীলা বলিল "তা-হ্যাঁ-মা, তোমার এই অসুখ, বাবার শরীরটাও ভাল নয়, এ অবস্থায় আমি কি ক'রে নেমন্তন্ন রাখতে যাই বলো তো ? এটা ওঁর মাথায় কিছুতেই ঢুকছে না কেন জানিনি।"

নরেশ এবার রাগিয়া উঠিয়া বলিল—"শুন্‌লেন তো মা, কি রকম আহাম্মুকের মতো কথা ! উনি যে আমার স্ত্রী, সেটা একেবারেই বেমালুম ভুলে গেছেন। চারু যখন কেবল আমার আর আমার স্ত্রীর অভিনন্দনের জন্যই আজকের এই সমারোহ ব্যাপারটা খাড়া করেছে, তখন আমার স্ত্রী হিসেবে ওর সহস্র ক্ষতি স্বীকার করেও যে আজ সেখানে উপস্থিত হওয়া নিতান্তই প্রয়োজন, এটা ও কিছুতেই বুঝতে পার্‌ছে না।"

রায় বাহাদুর মুকুন্দ মজুমদার তাঁহার দামী চামড়ার খাপ হইতে আর একটি বড় চুরুট বাহির করিয়া ধরাইতে ধরাইতে বলিলেন "আচ্ছা, এক কাজ করা যাক্ নরেশ। ওদের সকলকে একদিন আমাদের এখানে নিমন্ত্রণ ক'রে এনে বেশ পরিতোষ করে খাইয়ে দেওয়া যাক্, কি বলো ? এই তো আস্‌ছে মাসে লীলার বিয়ের ঠিক এক বছর পূর্ণ হবে, সেদিন একটা সাম্বৎসরিক উৎসবের আয়োজন করা যাবে এখন। বেশ নতুন

রকমের একটা ব্যাপার হবে, অনেকটা ইংরিজী ধরণের, কি বলো ?"

কল্যাণী মৃদু হাস্যে তাঁহার সম্মতি জানাইয়া বলিলেন "মন্দ নয়, সে একটা বেশ নতুন রকমের আমোদ হবে বটে। জন্ম-তিথির পূজো, বাৎসরিক শ্রাদ্ধ, এ সবই আমাদের রয়েছে, কিন্তু বিয়ের তো কই কিছু সাম্বৎসরিক স্মৃতির ব্যবস্থা নেই! ওটাও আরম্ভ ক'রে দিলে মন্দ হয় না।"

নরেশ ইত্যবসরে উঠিয়া গিয়া লীলার পিছন হইতে তাহার সোফার পিঠের উপর ভর দিয়া তাহার কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপি চুপি বলিতেছিল "পূজোর সময় তোমায় যে গ্রীক্ নেক্‌লেসটা কিনে দিয়েছি, সেটা পরলে তোমায় কেমন মানায় আমার সেটা একবার দেখবার ইচ্ছে আছে। সেইটি পরে' আজকে তোমায় নেমন্তন্ন যেতে হবে।"

লীলা ঘাড় নাড়িয়া মৃদুস্বরে বলিল "উহুঁ, মা-বাবাকে এ রকম অবস্থায় ফেলে রেখে আমি নেমন্তন্ন গিয়ে একটুও স্বোয়াস্তি পাবো না। নেকলেস্ ছড়াটা আমার গলায় যেন সাপের মত জড়িয়ে ধরেছে বলে মনে হবে।"

এমন সময় রায় বাহাদুর বলিলেন "তা'হলে রাজি আছো নরেশ! উৎসবের আয়োজনটা তবে স্থরু করে দিই ?"

ক্ষুব্ধ-ক্ষুণ্ণ-নিরাশ ও ব্যথিত চিত্তে নরেশ লীলার নিকট হইতে

সরিয়া আসিয়া বলিল "আচ্ছা—সে যা হোক্ এর পর করা যাবে না হয়, এখন যখন না—যাওয়াটাই সাব্যস্ত হোলো, তখন এই বেলা আমি তাদের একটা খবর পাঠিয়ে দিইগে"—বলিতে বলিতে নরেশ মুখখানি অন্ধকার করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল, মজুমদার সাহেব তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন "ওহে, শোন, শোন, চিঠিটা আমিই লিখে দিচ্ছি। তোমার লেখার চেয়ে আমার লিখে দেওয়াটাই এস্থলে যুক্তিযুক্ত ব'লে মনে হচ্ছে।"

কল্যাণী বলিলেন, "সেই ভাল, তুমি যখন বাড়ীর কর্ত্তা, তখন আমাদের সকলের হোয়ে তুমিই চারুকে লিখে পাঠাও। না যেতে পারবার কারণটা বেশ স্পষ্ট করে লিখো। আর দেখ, আমার নাম ক'রে আর একটু লিখে দিও যে, এই যে আজ আমরা কেউ তার ওখানে উপস্থিত হোতে পারলেম না, এটা আমাদের একটা পরম দুর্ভাগ্য বলে' মনে হচ্ছে; আর এই দুর্ঘটনার জন্যে সব চেয়ে বেশি দুঃখিত হোয়েছেন লীলার মা।"

কর্ত্তা শুনিয়া নিতান্ত অবজ্ঞার সহিত বলিলেন "আচ্ছা, আচ্ছা থামো, সে জন্যে তোমার কোনও চিন্তা নেই। আমি আজ এই বিশ বছরের ওপোর শুধু কলমের জোরেই এতগুলো জেলা শাসন করে' এসেছি; কি লিখতে হবে-না-হবে সে আর তোমাকে আমার কাছে বাত্লে দিতে হবে-না।"

এমন সময় কমলা আসিয়া দ্বারের বাহির হইতে বলিল "বাবা, আপনার নাইবার জল গরম হোয়েছে, স্নানের ঘরে পাঠিয়ে দেবো ? এখন নাইবেন কি ?"

কমলাকে দেখিয়া কল্যাণী বলিলেন, "হ্যাঁ বৌমা, তুমি তো কই আজ চা খেতে এলে না ?"

লীলা বলিয়া উঠিল, "বৌদি যে চা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে, আর কোনও দিন খাবে না বলেছে।"

নরেশ শুনিয়া বলিল "সত্যি বৌদি, কি ক'রে তুমি চা খাওয়া ছেড়ে দিলে বল'ত ? চা না খেয়ে আছো কেমন করে ?"

কমলা ইহার কোনও উত্তর না দিয়া নতমুখে ঈষৎ হাসিয়া শ্বশুরকে আবার স্নানের তাগিদ্ দিল। কর্ত্তা তখন্ ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তাই তো, স্নানের সময় হোয়েছে দেখছি ! তাঃ চলো, স্নানটা সেরে নিই।"

ড্রেসিং-গাউনটা খুলিতে খুলিতে মজুমদার সাহেব উঠিয়া কমলার সহিত বাহির হইয়া গেলেন। কল্যাণীও উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন, "যাই একবার রান্নাবান্নার কতদূর কি হ'চ্ছে দেখে আসি। নতুন বামুনঠাকুরকে নিয়ে বৌমা একা ভারি মুস্কিলে পড়েছে।"

লীলা বলিল "কিন্তু যাই বলো মা' লোকটা রাঁধে ভালো।"

"বাঙালী বামুন কি না, সব জানে শোনে" বলিয়া গৃহিণীও বাহির হইয়া গেলেন।

২

গৃহিনী পিছন ফিরিতে না ফিরিতে, নরেশ তড়াক্ করিয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া লীলা যে সোফাটায় বসিয়াছিল, তাহার উপর একেবারে লীলার গা ঘেঁসিয়া গিয়া বসিল। এবং তাহার কাঁধের উপর একটী হাত দিয়া তাহাকে ঈষৎ নিজের দিকে টানিয়া লইয়া বলিল, "তোমার সঙ্গে আমার গোটা কতক কথা আছে, এরা কেউ এসে পড়বার আগে তোমায় বলে নিই, শোনো।"

লীলা তখন একখানা বাঙলা মাসিকপত্র খুলিয়া দেখিতেছিল। নরেশকে বলিল, "দেখ, এবার কেমন সুন্দর ছবিখানি দিয়েছে! ওমার খৈয়ামের মুখখানি ঠিক যেন দাদার মতো হয়েছে, না?"

ব্যাকুল হইয়া নরেশ বলিল, "চারুর ওখানে আজ তোমায় নেমতন্ন যেতেই হবে লীলা, নইলে আমি আর তাদের মুখ দেখাতে পার্‌বো না!

লীলা মাসিক পত্রখানা আঙলের ফাঁকে মুড়িয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমিও ঠিক মনে করেছি, তুমি এই কথাই বলবে।"

"তাহলে যাবে তো, কেমন ?"

"কি ক'রবো, কিছু ঠিক করতে পার্‌ছিনি।"

"আমি তোমায় অনুরোধ কর্‌ছি, চল !"

"কিন্তু মার আর বাবার যে ইচ্ছে নয়।"

"কিন্তু আমার যে একান্ত ইচ্ছে !"

"মা বাবার অমতেও !"

"দেখ, তুমি যে আমার স্ত্রী, এটা তোমার মনে থাকে না কেন ?"

"আমি যে ওঁদেরই মেয়ে, এটাই বা তোমার মনে থাকে না কেন ?"

"তাহলে ওই সম্পর্কটাই তোমার বেশি হ'ল, কেমন ?"

"সেটা হওয়া কি কিছু বিচিত্র ব্যাপার ? ভূমিষ্ঠ হবার দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত যাদের স্নেহ-মমতায়, যাদের আদর-যত্নে এত বড় হোয়ে উঠলুম, তাদের উপর টানটা বেশি হওয়াই কি স্বাভাবিক নয় ?"

নরেশ সোফার উপর সজোরে একটা চাপড় মারিয়া বলিয়া উঠিল, "আলবাৎ নয় ! বরং বিবাহের পর বাপের বাড়ীর উপর মেয়েদের বেশি টান থাকাটাকে আমি অস্বাভাবিক বলেই মনে করি। বিয়ের দিন কি মন্ত্র পড়ে আমাকে বরণ করেছিলে, মনে আছে ? সুখে, দুঃখে, বিপদে, সম্পদে, চিরদিন তুমি

২

আমার অনুগামিনী হবে বলে অগ্নি আর দেবতা সাক্ষী করে যে সেদিন প্রতিশ্রুত হয়েছিলে ?"

লীলা হাসিতে হাসিতে উত্তর দিল "দেখ, সে অনেক রাত্রে লগ্ন ছিল, ঘুমের ঘোরে ঢুলতে ঢুলতে কি যে বলিছি কিছুই জানি নি। তার ওপর মন্ত্র-তন্ত্র তো সবই সংস্কৃত—কেবল অনুস্বর, বিসর্গ আর চন্দ্রবিন্দুতে ভরা; তার মানে যে কি তার একবিন্দুও আমি বুঝ্‌তে পারি নি। এ ছাড়া তার অর্দ্ধেক কথাও আমার মুখ দিয়ে উচ্চারণই হয় নি। বোধ হয় তোমারও হয়েছিল তাই। কেন না, সংস্কৃত ভাষায় তুমি যে আমার চেয়ে বেশি পণ্ডিত নও, এ কথা নিজেই কত দিন ব'লেছো। সে যাই হোক, সেই দুর্ব্বোধ্য মন্ত্র আউড়ে আমি আর যাই বলে' থাকি না কেন, তা বলে নেমন্তন্ন-বাড়ীতেও যে আমি বরাবর তোমার অনুগামিনী হবো, এ রকম প্রতিশ্রুতি আমি নিশ্চয়ই দিই নি। বিয়ের মন্ত্রটা কিছুই বুঝ্‌তে না পারলেও, আমার বিশ্বাস, তার ভিতর কোথাও এমন উপদেশের উল্লেখ নেই যে, লুচি সন্দেশের আহ্বান কখনও উপেক্ষা করবে না!"

"কিন্তু আমার আহ্বান যে তোমায় সর্ব্বদা মানতে হবে, এ সম্বন্ধে তো কড়া হুকুম আছে!"

"তা জানি, আর এও জানি যে, স্বামী আমার বাপ-মা'র অবাধ্য হ'তে কখনই আহ্বান করবেন না।"

"অবস্থা-বিশেষে সে রকম আদেশেরও যে প্রয়োজন হয় লীলা!"

"ভগবান করুন, আমার জীবনে যেন সে রকম অবস্থা না আসে!"

"ভগবান কি করবেন না করবেন বলতে পারি নি, কিন্তু নেমন্তন্ন আজ তোমার যাওয়াই চাই।"

"বেশ তো, ওঁদের মত করাতে পারো যদি, আমার যেতে কোনই আপত্তি নেই।"

"তাঁদের মতামতে কিছু এসে যায় না। আমি যদি মত করি, তা হলেই তোমার যাওয়া উচিত। কেন না, স্ত্রী কখনও স্বামীর অবাধ্য হবে না—এ উপদেশটা বোধ হয় কোনও মেয়ে মানুষেরই অজানিত নেই।"

"না, কিন্তু তার অনেক আগে থাকতেই যে পিতা মাতার কখনও অবাধ্য হবে না, এ শিক্ষাটাও তারা পায়। সেটাই বা চট্ করে ভুলি কেমন করে?"

"তাহ'লে দেখ্ছি স্বামীর চেয়ে পিতামাতাই তোমার বেশি আপনার!"

"শুধু আমার কেন, সকল স্ত্রীলোকেরই। স্ত্রী কোনও গুরুতর অপরাধ করলেই স্বামীরা তাদের অনায়াসে ত্যাগ করে; কিন্তু সহস্র দোষে দোষী হলেও বাপ মা কখনও মেয়েটিকে

অসহায় অবস্থায় ফেলে দিতে পারেন না—এটা তো জানো।"

"অনেক পিতামাতাই বর্জ্জন করেন আমি জানি!"

"সে তাঁরা সমাজের ভয়ে বুকের হৃৎপিণ্ড উপড়ে ফেলে করেন।"

"তা হ'লে তুমি স্বামীকে চাও না, পিতা মাতাকে পেলেই সুখী—কেমন?"

"না, আমি স্বামীকে চাই, কিন্তু পিতামাতাকে পরিত্যাগ ক'রে নয়।"

"বাপ মা কি সবার চিরকাল থাকে?"

"সে অশুভ দিনের কথাটা এত আগে আলোচনা ক'রে কোনও লাভ নেই বোধ হয়।"

"তোমার কোনও লাভ না থাক্‌তে পারে, কিন্তু আমার যথেষ্ট আছে। আমি জান্‌তে চাই যে, ওঁদের অবর্ত্তমানে তোমার আমার মধ্যে সম্পর্কটা ভবিষ্যতে কি রকম দাঁড়াবে?"

লীলার বড় বড় দুটি চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। সে নীরবে নতমুখে বসিয়া রহিল।

নরেশ তাড়াতাড়ি নিজের কোঁচার কাপড় দিয়া সস্নেহে তাহার চোখ দু'টি মুছাইয়া দিয়া মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বলিল "কেঁদে ফেল্‌লে লিলি! কেন, আমি তো তোমায় আঘাত দেবার জন্যে

কোনও কথা বলি নি। আমি শুধু জান্‌তে চেয়েছিলুম যে, তোমার পিতামাতার চেয়েও তোমার উপর আমার বেশি অধিকার আছে কি না ?"

লীলা কোনও উত্তর দিল না, অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইয়া আঁচলে চোখ রগড়াইতে লাগিল।

নরেশ ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল "আচ্ছা বেশ, আমি না হয় আর স্বেচ্ছায় আমার স্ত্রী হিসেবে তোমার উপর নিজের কোনও দাবী করবো না। স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধটা যত দিন না তুমি পিতা-মাতার সঙ্গে কন্যার সম্পর্কের চেয়েও বড় ক'রে দেখ্‌তে শিখ্‌বে, তত দিন না হয় তোমার জন্যে আমি অপেক্ষা ক'রে থাক্‌বো লিলি !"

অভিমানে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে লীলা বলিল, "কেন তুমি আজ আমাকে এত কষ্ট দিচ্ছ,—কি করিছি আমি ?"

আর্ত্ত ও বিপন্নের মতো কাতর কণ্ঠে নরেশ বলিল, "আর তুমি যে আজ আমার মনে কি কষ্ট দিচ্ছ লিলি—তা বোধ হয় নিশ্চয় বুঝ্‌তে পারতে, যদি তুমি একটুও আমাকে ভালবাস্‌তে।"

লীলার চোখ দুটি আবার জলে ভরিয়া উঠিল, ঠোঁট দুখানি কাঁপিতে লাগিল। অভিমান ও অনুরাগে ভরা অশ্রু-সজল আঁখি দু'টি স্বামীর দিকে ফিরাইয়া জড়িত অস্পষ্ট কণ্ঠে বলিল "আমি বুঝি বাসিনি ?"

তরুণী পত্নীর কম্পিত অধরপুটের এই ক'টি সোহাগের বাণী,

সলিল-সিক্ত নয়ন-কোণের একটু কেমন সেই অনুরাগ-বিচ্ছুরিত দৃষ্টি, অভিমানে উচ্ছ্বসিত কিশোরীর পরিপুষ্ট সুন্দর গণ্ডদ্বয়ের সেই অরুণ-রাঙা রক্ত-আভা, নরেশকে একেবার মুগ্ধ করিয়া দিল। নরেশ তাহাকে আবেগ ভরে আপন বাহু-বন্ধনে টানিয়া লইয়া, অভিমানিনীর সজল আঁখি-পল্লব দু'টিতে বারম্বার চুম্বন করিয়া সহাস্য মুখে বলিল, "বাসো? আচ্ছা, তবে বল দেখি লীলা, ও কথাটার মানে কি? ওটা তো আর সংস্কৃত কথা নয়!"

লীলাও হাসিয়া ফেলিল। হাসিতে হাসিতে নিজেকে নরেশের আলিঙ্গন-পাশ হইতে মুক্ত করিয়া লইয়া বলিল, "ছাড়, সকাল বেলা কেউ এসে পড়বে এখুনি; কিন্তু মনে থাকে যেন—আর ওসব অলুক্ষুণে কথা মুখে আন্‌বে না। তাহ'লে আমি ভয়ানক কাঁদ্‌বো, আর মা বাবা শুন্‌তে পেয়ে দৌড়ে আসবেন, খালি জিজ্ঞাসা করবেন 'কি হ'ল—কি হয়েছে?' তখন কি যে হয়েছে আমি কিছু তাঁদের বলতেও পার্‌বো না! সে একটা মস্ত বড় কেলেঙ্কারী হ'বে কিন্তু!"

লীলার মুখে আবার তাহার পিতা-মাতার উল্লেখ শুনিয়া নরেশের মুখের হাসি মিলাইয়া গিয়া মুখখানা অন্ধকার হইয়া উঠিল। অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে নরেশ বলিল "চিরজীবন চোখের জল ফেল্‌বার চেয়ে এইবেলা দু' ফোঁটা কেঁদে নেওয়াই কি ভাল নয় লীলা?"

লীলা নরেশের এ প্রশ্নের অর্থটা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় তার সর্ব্ব-শরীর শিহরিয়া উঠিল। সহাস্য প্রফুল্ল মুখখানি তার সহসা বিচ্ছিন্ন কমলের মতো বিবর্ণ হইয়া গেল। সভয়ে বালিকা জিজ্ঞাসা করিল "কেন? আমি কি করেছি যে আমার অত বড় শাস্তি হবে?"

নরেশ যেন উদাস ভাবে বলিতে লাগিল—"বিবাহিত জীবনের সমস্ত কর্ত্তব্য যারা মাল্য-দানের সঙ্গেই চুকিয়ে ব'সে থাকে, হৃদয় দান করে না,—বিবাহ-বন্ধনের সূত্রে প্রেমাস্পদের কাছে নিজের সব কিছু বিলিয়ে দিয়ে আপনাকে যে সম্পূর্ণ ভাবে ধরা দেয় না,—যাদের পরিণয়ের মধ্যে প্রেমের যোগ সম্পর্ক নেই, ভালবাসার অটুট বন্ধন নেই,—যারা মুখে স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হবে স্বীকার করেও কার্য্যতঃ পশ্চাৎপদ হয়—তাদের ভবিষ্যৎ জীবন নিশ্চয়ই অন্ধকার হ'য়ে ওঠে! যে পরিণয়ের পুণ্য-ছায়ায় দু'টি হৃদয় একত্র মিলিত হ'য়ে স্নেহে, প্রেমে, অনুরাগে সার্থক ও ধন্য হ'য়ে ওঠে, মানুষের জীবনের সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখ-সম্পদ থেকে আজ আমি শুধু বঞ্চিত নই লীলা, আমার জীবন বোধ হয় ব্যর্থ হয়ে যেতে বসেছে! আমার ভয় হচ্ছে, হয় ত এর পর আমার বেঁচে থাকাও দুর্ব্বহ হ'য়ে উঠবে!"

ভয়-ব্যাকুল কণ্ঠে লীলা বলিতে গেল "আমার দোষেই কি—" বাধা দিয়া অসহিষ্ণুর মতো নরেশ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া

পড়িল এবং ঘরের ভিতর ইতস্ততঃ পদচারণা করিতে করিতে বলিতে লাগিল, "দোষ কারুর নয় লীলা! দোষ আমার অদৃষ্টের! আমি চোখের সামনে আমার শোচনীয় ভবিষ্যৎ স্পষ্ট দেখতে পেয়েও তবু এখনও আশার ছলনায় ঘুরে মরছি! আমি ভেবেছিলুম, আমার এই অগাধ উচ্ছ্বসিত ভালবাসার স্রোতে তোমাকেও ভাসিয়ে নিয়ে স্বচ্ছন্দে এক দিন আমার হৃদয়ের প্রেমাস্তীর্ণ উপকূলে টেনে নিয়ে আসতে পারবো, কিন্তু আজ আমার সকল চেষ্টা—সকল যত্ন—যেন ব্যর্থ বলে মনে হচ্ছে। তোমার প্রতি আমার অপরিসীম ভালবাসা আজ যেন আমাকেই উপহাস করছে! কিন্তু তবু এখনও আমি একেবারে হতাশ হই নি লীলা! প্রাণপণে তোমাকে জয় কর্‌বার একটা শেষ চেষ্টা করেও যদি অকৃতকার্য্য হই, তখন তোমার কাছ থেকে আমি জন্মের মতো বিদায় নেবো, তার আগে নয়।"

নরেশের এই দীর্ঘ বক্তৃতা শুনিয়া বিস্মিত ও বিক্ষুব্ধ হইয়া লীলা বলিল "তুমি কি বল্‌ছো আমি বুঝ্‌তে পারছি নি! আমাকে জয় কর্‌বার জন্য প্রাণপণে একবার শেষ চেষ্টা করবে, এ সব কথার মানে কি?—আমি তো তোমার হাতেই আত্ম-সমর্পণ করিছি—"

নরেশ আবার তাহাকে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "একে আত্ম সমর্পণ বলে না লীলা। আমি জানি, আমি কি পেয়েছি।

মাণিকের লোভে নন্দনের কোনও এক অপূর্ব্ব ভুজঙ্গিনীর অবহেলায় পরিত্যক্ত বিচিত্র খোলসটাকে আমি আজ বড় আগ্রহে কণ্ঠে দুলিয়েছি। তাই তার শিয়রের মণি আমার হৃদয় আলো করতে পারলে না। জান কি লীলা, আমি তোমায় কতখানি ভালবাসি—?"

লীলার ঠোঁট দুখানি তখন রাগে অভিমানে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। মুখখানি হেঁট করিয়া সে বলিল, "তা যদি বাসতে, তা'হলে কখনই আমায় এমন সব ভয়ানক কথা ব'লে কষ্ট দিতে না। আমি তো এক দিনও এমন শক্ত শক্ত কথা বলে তোমাকে ব্যথা দিই নি!"

অস্থির হইয়া অধীর ভাবে নরেশ বলিতে লাগিল, "কেন দাও না, কেন তুমি দাও না!—আমি তো দংশনের ভয় করি নি, গরলের জ্বালাকে গ্রাহ্য করি নি—আমি যে 'মণি' চেয়েছিলুম, শুধু মণি চেয়েছিলুম!—কিন্তু কই, পেয়েছি কই?—দাও, দাও লীলা, তোমার প্রেমের পরশমণি দিয়ে আমাকে সার্থক করে দাও,—আমাকে ধন্য করে দাও—!"

নরেশের ভাবগতিক দেখিয়া—তাহার এই উন্মাদের মতো অসংলগ্ন কথাবার্ত্তা শুনিয়া—লীলা শঙ্কিত হইয়া উঠিল। ভীত বিবর্ণ মুখে বলিল, "তুমি যে কি চাইছো, আমি তো তা ঠিক বুঝ্‌তে পারছিনি!"

নরেশ তখন একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া একেবারে লীলার সম্মুখে আসিয়া বসিল। তাহার হাত দুইখানি সাদরে নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া বলিল, "আমি জানি তুমি আমার সব কথা ভাল বুঝ্‌তে পারো না লিলি, কিন্তু এক দিন পারবে। আজ শুধু কর্ত্তা-গিন্নীর অমত থাকলেও, কেবল আমার অনুরোধ রাখতে তুমি চারুর ওখানে চল।"

লীলা নীরবে ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল।

নরেশ অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল "যাবে কি? বলো, পারবে না?"

অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত কুণ্ঠিত ভাবে লীলা বলিল, "তুমি কেন এ বিষয়ে এত পেড়াপিড়ি করে আমাকে মুস্কিলে ফেল্‌ছো? তুমি কি জান না যে, তাঁদেব অমতে আমি কিছুই করিনি।"

নিতান্ত বিরক্তির সহিত লীলার হাত দুটীকে নিজের মুঠার ভিতর হইতে সজোরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, সশব্দে চেয়ারখানাকে তিন হাত পশ্চাতে ঠেলিয়া নরেশ উঠিয়া দাঁড়াইল। পাশের টেবিলটার উপর একটা প্রচণ্ড চাপড় মারিয়া বলিল "ব্যস্—আর না—আজই আমাকে এর একটা হেস্ত-নেস্ত করতেই হবে।"

লীলাও উঠিয়া দাঁড়াইল। মুখখানি আঁধার করিয়া বলিল "আজ তোমার কি হয়েছে,—তুমি তো কখন এমন রাগারাগি কর না।"

তীব্র কণ্ঠে নরেশ উত্তর করিল, "আর আমি সহ্য করতে পারছি নি লীলা! এ রকম করে আর আমাদের চল্‌বে না। হয় তুমি বাপ-মাকে ছাড়, নয় তো আমায় ছেড়ে দাও—"

লীলা কাঁদিয়া ফেলিল। নরেশের কাছে ইতিপূর্ব্বে সে আর কখনও এমন ভৎসনা পায় নাই। আপন বস্ত্রাঞ্চলে চোখ দুটী চাপা দিয়া অভিমানিনী ফোঁপাইতে লাগিল।

নরেশ অনেকক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া, শেষে ধীরে ধীরে তাহার নিকটে অগ্রসর হইয়া, অসীম মমতার সহিত তাহাকে আপন বক্ষের উপর টানিয়া লইল। পরম স্নেহে তাহার স-অঞ্চল হাত দুখানিকে চোখের উপর হইতে নামাইয়া দিল—কপালের উপর হইতে মাথার চুলের উপর দিয়া পিঠের দিক পর্য্যন্ত অতি সযতনে অতি সন্তর্পণে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে, আদরের সহিত বলিল, "কেঁদ না, ছিঃ! চুপ কর। তোমায় তো কোনও দোষ দিচ্ছি নি আমি। তোমার একটা অপরাধ শুধু এই যে, তুমি হাসির মধ্যেও যেমন অপরূপ সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হোয়ে ওঠো, কান্নার ভিতর দিয়েও ততোধিক!—তোমার এই ফুলের কুঁড়ির মতো মুখখানি যেন প্রতি দিন আমার চোখে নিত্য নূতন শোভায় বিকশিত হোয়ে উঠ্‌ছে! তোমার অকলঙ্ক হৃদয়ের মধু-সৌরভে আমার চিত্ত বিহ্বল হোয়ে যায়! আমি তোমাকে চাই লীলা! একেবারে পুরোপুরি দখল করে থাকতে

চাই। তোমার উপর অন্য কারুর অধিকার—তা সে যেই হোক্ না কেন—আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না। আমি তোমাকে নিয়ে আমার চারিদিক ভরিয়ে রাখতে চাই। আমার দুঃখ, আমার বেদনা আমি তোমার শুভ্র হাস্যে ডুবিয়ে দিতে চাই! ছিঃ, চুপ কর; লক্ষ্মী আমার—কেঁদ না। ও কি, আবার চোখ রগড়াচ্ছ! চোখ দু'টি রাঙা হোয়ে উঠলো যে! কেউ দেখে জিজ্ঞাসা কর্‌লে কি বল্‌বে বল'তো?—দাঁড়াও, আমি মুছিয়ে দিচ্ছি—ওই কে আসছে যেন—মা বোধ হয়,—নাঃ, বৌদি—"

এমন সময় কমলা কক্ষের ভিতর আসিয়া,—যেন কত রাগিয়াছে এমনই ভাবে বলিতে লাগিল, "বলি, সকাল থেকে দুটিতে মিলে কি এতো গুজ্‌-গুজ্‌-ফুস্‌-ফুস্‌ হ'চ্ছে শুনি?—কতখানি বেলা হোয়েছে, হুঁস আছে? আজ কি আর তোমাদের নাইতে খেতে হবে না? ওঁরা যে সব বকাবকি করছেন।"

কমলা কথাগুলা খুব রাগ করিয়া বলিবার চেষ্টা করিলেও, তাহার অধর প্রান্তে যে গোপন হাসির রেখাটুকু উঁকি মারিতেছিল, উহাই তাহার ক্রোধের সমস্ত কৃত্রিমতাটুকু ধরাইয়া দিল। নরেশ হাসিতে হাসিতে বলিল, "এই যে ভাই, এখনি যাচ্ছি। হুকুম করলেই তো হয়, অত রাগারাগি করবার কি দরকার?—যাও তো লীলা, একছুটে গিয়ে স্নান করে নাওগে তো—"

লীলা বলিল "তুমি আগে যাও। সত্যি, ঢের বেলা হ'য়ে গেছে!"

"এই যে আমি এলুম বলে—তুমি ততক্ষণ এগোও না। তোমার বৌদির সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে।"

"আচ্ছা, তুমি আগে বল যে আমার ওপোর একটুও রাগ করনি?"

"একটুও না। আমি তো কতবার বলিছি, যে, তোমার উপর আমি জীবনে বোধ হয় কখনও রাগ কর্‌তে পারবো না।"

"আচ্ছা দেখ্‌বো। বৌদি, তুমি সাক্ষী রইলে ভাই। যদি করে, তাহ'লে তোমার ওপোর ওর শাস্তির ভার রইল।"

কমলা এবার তাহার কৃত্রিম রাগও ভুলিয়া গিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "সেজন্যে তোর ভাবনা নেই,—এমন শাস্তি দোবো তখন, যে, শেষ তুইই হয় ত' এসে বল্‌বি 'এবারটি ওকে মাপ কর ভাই বৌদি!' তখন কিন্তু আমি কারুর কথা শুনবো না, তা আগে থাক্‌তে বলে রাখ্‌ছি।"

"হ্যাঁ—তা বই কি,—আচ্ছা দেখবো তখন।" বলিতে বলিতে লীলা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

৩

লীলা ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবামাত্র, কমলা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নরেশের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "দু'জনে মানভঞ্জনের পালা গাইছিলে বুঝি? তা আমার সঙ্গে আবার কি দরকারটা শুনি?"

"যদি কাউকে না বল' তো তোমায় বলি।"

"সে রকম কথা আমি শুনতেও চাই না।"

"কেন কমলা, একটা মনের কথা তোমার কাছে খুলে বলতে চাই, তা তুমি শুনবে না?"

"কারুর মনের কথা শোনবার আমার মোটেই ফুরসুৎ নেই।"

"কেন, আগে তো খুব শুন্‌তে। সেই ছোটবেলায় যখন তুমি আমি দুটি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে—গাঁয়ের পাঠশালায় এক সঙ্গে পড়তে যেতুম, রায়েদের পুকুরে সাঁতার কাটতুম, ঘোষালদের বাগান থেকে আঁম পেড়ে আনতুম, তেলিদের পোড়ো গোয়াল-ঘরটায় ছুটীর দিন সারা দুপুর বেলাটা দু'জনে খেলা ক'রে কাটিয়ে দিতুম—তার পর সেই যে আমাদের গ্রামে যখন কি একটা মহামারী এসে আমাদের দুজনকে একেবারে পিতৃ-মাতৃহীন অনাথ করে দিয়ে গেল,—সেদিনও তো তুমি আমি বিশেষ তফাৎ

হ'তে পারি নি! বুড়ো দয়াল ঠাকুর এক সঙ্গেই তোমার আমার হাত ধরে নিয়ে এসে যেদিন ভঞ্জুদের বাড়ী রেখে গেল, তুমি সেদিন তোমাদের কুঁড়ে ঘরখানার জন্যে হাপুস নয়নে কত কেঁদেছিলে—আমি কিন্তু কাঁদতে কাঁদতেও তোমাকে কত ভুলিয়েছিলুম তা মনে আছে?—তার পর দেখতে দেখতে কত দিন কেটে গেল। আমি বড় হোয়ে কোলকাতায় যেদিন পড়তে এলুম, তুমি স্নেহময়ী বোনটীর মতো চক্ষের জল মুছতে মুছতে আমার সব গুছিয়ে দিয়েছিলে।...

তার পর সে এক পূজোর ছুটীতে শশাঙ্ক এলো আমাদের দেশটা দেখ্‌তে—দেশ দেখ্‌তে এসে তোমাকেও সে দেখে গেল, কিন্তু আর ভুলতে পারলে না।"

কমলা ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল "আর থাক্ কথক ঠাকুর,— তোমাকে আর সে সত্যযুগের কুলুচি আওড়াতে হবে না। হঠাৎ আজ ও-সব পুরোনো কাসুন্দী ঘাঁট্‌তে ব'সেছ কেন শুনি।"

"আজ আমার দুর্দ্দিনে একটা দুঃখের কথা বলতে চাইলুম বড় মুখ করে তোমার কাছে—আর তুমি কি না স্বচ্ছন্দে বললে, তোমার শোনবার সময় নেই। অথচ এই তুমিই ছিলে সেদিনও পর্য্যন্ত এই অনাথ অনাত্মীয়ের একমাত্র আপনার জন! তখন তো আমার কোনও কথা শোনবার তোমার অবসরের অভাব হোতো না কমলা! লীলাকে আর আমাকে ঠকিয়ে আমাদের সব

মনের কথাগুলি তো সেদিনও পর্য্যন্ত একটি একটি ক'রে টেনে বার ক'রে নিয়ে উপভোগ করেছো? এখন আবার আমাদের ওপোর এমন বিরূপ হচ্ছ কেন কমলা!" বলিতে বলিতে নরেশ দুই হাত বাড়াইয়া ব্যগ্র ভাবে কমলার হাত দু'খানি ধরিল। কমলা হাসিতে হাসিতে সন্তর্পণে হাত দু'খানি ছাড়াইয়া লইয়া বলিল "চিরদিন কি সবার সমান যায় নরেশদা?"

নরেশ যেন একটা আরামের—একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "আঃ! আজ কত দিন পরে তোর মুখে এই ছেলেবেলার ডাকটা শুনে আমার ভারি আহ্লাদ হচ্ছে কম্‌লি!"

কমলা চ'খে হাসিতে হাসিতে, মুখে ধমক দিয়া বলিল, "খবরদার্! বৌদি বলে ডাকো,—আমি না এখন তোমার গুরুজন?"

নরেশ প্রথমটা থতমত হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু তার পর কমলার চোখে চোখ পড়িতেই সেও হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "ওহো—তাও তো বটে,—বড় ভুল করে ফেলেছি বৌদি; মাপ কর ভাই।"

"উহুঁ, একেবারে মাপ হোতেই পারে না,—অন্ততঃ লিলিকে দিয়ে একবার কাণ মলিয়েও দেওয়াবো।"

"তা দিও। আচ্ছা বৌদি, তুমি যে তখন বল্‌লে চিরদিন কারুর সমান যায় না,—তার মানে কি তুমি বলতে চাও যে, তোমার দিন এখন ফিরেছে?"

"তা জানি নি, হয় ত বা ফিরেছে—আমার জন্মাবচ্ছিন্ন দুর্ভাগ্যের আর একটা চড়া পর্দ্দায়—কিন্তু, সে যা হোক্, তোমার দিন যে ফিরেছে, সে তো আর অস্বীকার কর্‌তে পারো না ?"

"কেন ?—কিসে বুঝ্‌লে ?"

"বাঃ—অমন জলজ্যান্ত প্রমাণ রয়েছে তার! লীলাকে যে পেয়েছে তার সময় ফেরে নি—এ কথা কেউ এক-গলা গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে বল্‌লেও আমি বিশ্বাস কোরবো না।"

"কিন্তু লীলাকে যে আমি মোটেই পাই নি! তোমার যে গোড়াতেই গলদ হচ্ছে!"

"বটে? তাই না কি? লীলা আজ তোমার বিবাহিতা পত্নী—অথচ তুমি তাকে পাও নি কি রকম?"

"জিজ্ঞাসা ক'রছো কেন কমলা? তুমি বুদ্ধিমতী—তুমি কি এখনও সেটা বুঝ্‌তে পারো নি? তোমার তীক্ষ্ণদৃষ্টিকে তো কিছুই এড়িয়ে যেতে পারে না।"

"কি জানি ভাই! আমার ধারণা ছিল যে, তোমাদের দু'টিতে বেশ মাণিকজোড় বেঁধেছে!"

"কেন আমাকে মিথ্যা বোঝাবার চেষ্টা ক'রছো কমলা? তুমি সব জানো, কেবল মুখে কিছু স্বীকার কর না। আমি আজকাল এটা বেশ লক্ষ্য করিছি—তুমি আমাকে যথাসাধ্য এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করো। আর তেমন ক'রে তুমি আমাদের সঙ্গে মেশো না।

আগে যেমন আমাদের আলাপের, আমোদের, রহস্যের, কলহের মধ্যে তোমার আসনখানি সুপ্রতিষ্ঠিত দেখতুম, আজ তা শূন্য হ'য়ে গেছে! আগে যেমন প্রতিদিন তুমি এসে আমাদের হাসি-অশ্রুর, মান-অভিমানের সমান ভাগ নিয়ে আমাদেরই মধ্যের একজন প্রধান হয়ে থাক্‌তে, আজ তেমনিই সে সব থেকে যথাসাধ্য তফাৎ থাক্‌বার চেষ্টা করো! কেন কমলা, আমি কি তোমার কাছে কোনও অপরাধ করেছি? না জেনে তোমার মনে যদি কোনও কষ্ট দিয়ে থাকি,—হাস্যপরিহাসের ফাঁকে, অজ্ঞাতসারে যদি কোনও দিন তোমার অমর্য্যাদা ক'রে থাকি—আমায় তুমি মাপ কর। আমি অকৃতজ্ঞ নই। আমি ভুলিনি যে, তোমার অনুগ্রহেই আমি আমার বড় আকাঙ্ক্ষিত ধন লীলার পাণিগ্রহণ করতে পেরিছি। যেদিন শশাঙ্কর মৃত্যু-সংবাদ বজ্রাঘাতের মতো আমার কাছে এসে পৌঁছল—আমি পাগলের মতো ছুটে এসেছিলুম তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে তোমার দেশের সেই নির্জ্জন কুঁড়েখানিতে—কিন্তু এসে দেখলুম, তোমার সিংহাসন এখানে অটল হয়ে গেছে; অত বড় ভূমিকম্পেও তাকে কিছুমাত্র বিচ্যুত করতে পারে নি! আমি হয় ত সেদিন নিশ্চিন্ত হ'য়ে ফিরে যেতে পারতুম কমলা, কিন্তু লীলার আকর্ষণ আমাকে টেনে ধরে রাখলে। তোমাকে সান্ত্বনা দিতে আসবার অছিলায় রোজ আমি লীলাকেই দেখ্‌তে আসতুম। তোমার বিপদে আমার অসীম

সহানুভূতি জেনে, মমতাময়ী সরলা লীলা আমাকে সাহায্য করতে ছুটে আস্‌তো—ভাবতো কতই না আমি তোমার উপকার করছি—”

“অথচ উপকারটা তখন আমিই করেছিলুম তোমার—কি বলো ?”

“নিশ্চয় ! কিন্তু সে তা কোন দিন সন্দেহও করতে পারে নি—এমনই নির্ম্মল ছিল ওর অন্তরখানি !”

“আজও সে ঠিক তেমনিই আছে নরেশদা।”

“তা জানি কমলা।—কিন্তু এখন যেন আমার মনে হয়, তাকে আরও কিছু দিন সময় দিলে হোতো। বড় তাড়াতাড়ি তার মাথায় পত্নীর গুরুতর কর্ত্তব্যভার চাপিয়ে দিয়েছি আমি। কিন্তু সেটুকু বিলম্ব করবারও উপায় ছিল না আর। এখানে আমার ঘন ঘন আসা যাওয়াতে, পাড়ার নিষ্কর্ম্মা লোকেরা তোমার-আমার নামে একটা কুৎসা রটাবার উদ্যোগ ক’রছে শুনে, আমি আর অপেক্ষা করতে পারিনি। তোমার সম্মান, নিজের সুনাম বাঁচাবার জন্যে আমি ব্যস্ত হ’য়ে লীলাকে গ্রহণ করবার প্রস্তাব করেছিলুম। এমন কি রায় বাহাদুর মুকুন্দ মজুমদারের প্রস্তাবে ঘরজামাই হোয়ে থাকার অপরিসীম লজ্জাটাও অম্লান বদনে স্বীকার করেছি।”

কমলা অন্যমনস্ক ভাবে বলিল “হ্যাঁ, তুমি সকলকে ভারি আশ্চর্য্য করে দিয়েছিলে বটে !”

"আমি নিজেও আমার সেই নির্লজ্জতায় বড় কম আশ্চর্য্য হই নি কমলা! নিজের দুঃসাহসে নিজেই বিস্মিত হ'য়ে গেছলুম। একটা জীবনব্যাপী সুখ দুঃখের ঘটনায় আমি এমন মরিয়ার মতো ঝাঁপিয়ে পড়িছিলুম যে, আজও সেদিনের কথা মনে ক'রে আমি শিউরে উঠি!"

"মরিয়ার মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিলে কি রকম?—লীলাকে তো সেই প্রথম দিন থেকেই তুমি আপনার করতে চেয়েছিলে?"

"হ্যাঁ চেয়েছিলুম সমস্ত অন্তরের মধ্যে জীবনব্যাপী করে—চেয়েছিলুম আমার সমস্ত কাজে অকাজে—চিন্তায় জাগরণে—কিন্তু লীলা আমাকে তেমন ক'রে ধরা দেবার আগেই আমি তাকে গ্রহণ করে নিজেই আজ পিঞ্জরাবদ্ধ হয়েছি কমলা।"

"তার মানে?"

"মানে যে ঠিক কি, তার ব্যাখ্যা বোধ হয় আমার মতো অবস্থায় পড়লে কোনও পণ্ডিতেও করতে পারে না। আমি তখনই বুঝতে পেরেছিলুম যে লীলা এখনও বালিকা! সদ্য-সমাগত যৌবন তার তরুণ তনুখানি ঘিরে সেদিন আনন্দে নৃত্য ক'রে ফির্‌ছিল বটে, কিন্তু তার হৃদয়ের কিশোর অন্তঃপুরে তখনও প্রবেশ লাভ করতে পারে নি। তবু আমার আশা ছিল যে, এক দিন আমার প্রেমের যাদু-স্পর্শে ওর অন্তরে-বাহিরে যৌবন সাড়া দিয়ে উঠে, ওকে প্রকৃত তরুণী করে তুল্‌বে—কিন্তু হতাশ হয়েছি

কমলা। প্রেমের আকুল আহ্বান বৃথাই তার হৃদয়-দ্বারে বারবার করাঘাত করে নিষ্ফল হয়ে ফিরে এসেছে! সে যেন এক অনন্ত কৌমার-কোরক,—কোন দিনই ফলে ফুলে সার্থক হ'য়ে ফুটে উঠবে না! অন্ততঃ আমি তো হার মেনেছি ভাই। এত চেষ্টা কোরেও পারলুম না তার পাপড়ীর আবরণগুলি একটী একটী ক'রে খুলে দিয়ে এই অনিন্দ্য পদ্মকলিকে বিকশিত শতদলে পরিণত করতে। তুমি যদি একটু চেষ্টা কর কমলা, বোধ হয় নিশ্চয় পারো তার মধ্যে নারীর যথার্থ রূপটিকে ফুটিয়ে তুলতে! তোমাকে সে বড্ড ভালবাসে। তোমার উপদেশ তার কাছে বেদবাক্য! তার নিভৃত মনের বিজন কোণে এমন কোনও গোপন কথাটি নেই, যা সে তোমার কাণে কাণে নিবেদন করে দেয়নি! তা ছাড়া, তুমি যে বিশেষ করে জানো কমল—কাকে বলে অপরের জন্যে আত্মবলি দেওয়া! আর এও তো শুনলে ভাই, যে, সব দিক দিয়ে সম্পূর্ণ ভাবে সে ধরা দেবার আগেই, ব্যস্ত হ'য়ে—আমিই তাকে স্বেচ্ছায় বন্দিনী করেছি—যা হয় তো এ জীবনে কোন দিনই পারতুম না—যদি না করুণাময়ী তোমার অযাচিত অজস্র স্নেহধারা আমাকে আশৈশব অভিষিক্ত করে রাখতো। তুমিই যখন দয়া করে এই দুর্লভ রত্নটি এমন কাঙালের হাতে তুলে দিয়েছো, তখন তুমিই আজ ওকে হাত ধ'রে, ওর পিতামাতার মোহপাশ থেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে, আমার

কুটীরাভিমুখিনী করে দাও—আমার অন্তরাভিমুখিনী করে দাও—আমার প্রেমাভিমুখিনী করে দাও !”—

কমলা তাহার দুই আঁখি বিস্ফারিত করিয়া বলিল “আমি !”

নরেশ মিনতি করিয়া বলিল “হ্যাঁ কমলা, তুমি !—দেবে না কি ?”

দৃঢ়তার সহিত ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে কমলা বলিল “উঁহু।”

নরেশ ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল “কেন কমলা ?”

কমলা গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল “না ভাই,—ওসব পারবো না।”

বিস্ময়-বিহ্বল নরেশ কাতর ভাবে বলিতে লাগিল, “পারবে না কমলা ? কিন্তু যদি কেউ তা সম্ভব করতে পারে, তো সে কেবল একা তুমিই ! কারণ, আমি জানি, তুমি তাকে ভালবাসো নিজের সহোদরার অধিক।”

কমলা অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, “দেখো, আমি তাকে মার পেটের বোনের মতোই স্নেহ করি সত্য, কিন্তু এ বিষয়ে—”

নরেশ তাহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল, “তুমিই একমাত্র উপযুক্ত। কেন না, সব রকম মানুষের মনের একেবারে নিভৃত স্থানটিতে পর্য্যন্ত গিয়ে পৌছবার তোমার একটা অসাধারণ শক্তি আছে। আমি লক্ষ্য ক’রে দেখিছি কমলা, যে, যখনই আমাদের স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে কোন বিষয় নিয়ে একটা তুমুল তর্ক

উঠেছে, আর শেষটা যখন দু'জনে গিয়ে তোমাকেই আমাদের মধ্যস্থ মেনেছি, দু'পক্ষের কি বলবার আছে—আগাগোড়া সব শুনে, তুমি যখনই যে রায়টি দিয়েছো,—প্রতিবারই তোমার সে সিদ্ধান্তটুকু আমার অন্তর স্পর্শ ক'রে যেন অল্প দু'কথায় একেবারে একটা দীর্ঘ পরিচ্ছেদের সমস্ত ইতিহাসটা আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে।"

মৃদু মধুর হাস্য করিয়া কমলা বলিল, "তোষামোদীতে তোমার দক্ষতার পরিচয় আমি এর আগেও অনেকবার পেয়েছি নরেশদা! ওকাজটায় তুমি যে বেশ পটু, এ সম্বন্ধে আমি তোমাকে অযাচিত ভাবে একখানা প্রশংসাপত্র লিখে দিতে প্রস্তুত আছি।"

অপ্রতিভ হইয়া নরেশ বলিতে গেল, "তোষামোদ কমলা! একে তুমি তোষামোদ মনে করলে? যে জন্যে আজ আমি কাতর হোয়ে তোমার সাহায্য চাইছি—আমার অনুরোধটা কি এর বিরুদ্ধে—"

বাধা দিয়া কমলা বলিল, "আর থাক্ বক্তৃতা-বাগীশ মশাই।—আর আপনাকে বচন আওড়াতে হবে না। সেই যে কথায় বলে—

'কর্ম্মে কুঁড়ে, ভোজনে দেড়ে
বচনে মারে পুড়িয়ে পুড়িয়ে।'

এ বর্ণনাটা দেখছি তোমার সঙ্গে ঠিক হুবহু মিলে যায়।

যাই হোক, তোমায় স্পষ্ট বলাই ভালো—যে, তুমি যা আব্দার ধরেছো, আমার দ্বারা সেটি হওয়া অসম্ভব।”

নরেশ কাতর হইয়া বলিল “দোহাই তোমার—এটুকু ক’রে দিতেই হবে।”

“আমি কিছুতেই তা পারবো না!”

“কেন ভাই, তোমার পক্ষে এটা তো কিছু শক্ত কাজ নয়।”

কমলার মুখখানি হঠাৎ যেন বিবর্ণ হইয়া গেল। সে অনেকক্ষণ মাথাটি নীচু করিয়া কি ভাবিতে লাগিল; তার পর সহসা বিদ্যুৎ-চমকের মতো নরেশের দিকে ফিরিয়া বলিল, “আমার পক্ষেই এটা সব চেয়ে শক্ত কাজ নরেশদা।”

সবিস্ময়ে নরেশ কমলার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। কমলা সে দৃষ্টির সম্মুখ হইতে তৎক্ষণাৎ মুখখানি ফিরাইয়া লইল। নরেশ ধীরে ধীরে অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত বলিল “তার কারণটা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?”

মুহূর্ত্তের জন্য কমলা কি যেন ভাবিয়া লইল; তার পর নরেশের দিকে ফিরিয়া অত্যন্ত কঠিন হইয়া বলিল, “না! আর জিজ্ঞেস্ করলেও আমি তা বোলবো না। কারণ—” এই পর্য্যন্ত বলিয়াই কমলা থামিয়া গেল। তার পর মাথাটি নীচু করিয়া পায়ের আঙুলে মেঝের উপরের কার্পেটখানা খুঁটিতে খুঁটিতে বলিল, “থাক্—এখন আর তা শুনে তোমার কোনও লাভ নেই।”

উৎকণ্ঠিত হইয়া নরেশ বলিল, "না—না, তোমায় ব'লতেই হবে। নইলে আমি স্থির হ'তে পার্‌ছি না।"

কমলা তখন কি যেন বলিবার জন্য আর একবার মুখটি তুলিয়া নরেশের দিকে চাহিল। তাহার ঠোঁট দুখানিও ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল; কিন্তু কিছুই সে বলিতে পারিল না। ক্ষণিকের জন্য নরেশের মুখের দিকে শরাহত পক্ষীর মতো করুণ নেত্রে চাহিয়া থাকিয়া, কমলা হঠাৎ সে ঘর হইতে ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

নরেশ অবাক্ হইয়া স্তম্ভিতের মতো কিছুক্ষণ সেদিকে চাহিয়া রহিল; তার পর নিকটস্থ একখানা চেয়ারে পথশ্রান্তের মতো অলস ভাবে বসিয়া পড়িল।

৪

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার পর নরেশ আপন মনে বলিতে লাগিল—"যাক্, এ পথও বন্ধ দেখছি! লীলা তো আমার একটা কথাও বুঝ্‌তে পারে না,—যে পারে সে তো শুনলেই না! এখন উপায়? শীগ্‌গিরই এর যাহোক একটা হেস্ত-নেস্ত না করতে পারলে, হয় তো এর পর এদের সঙ্গে আমার একটা বিরোধ উপস্থিত হ'তে পারে। আমি বেশ বুঝতে পারছি, এ রকম অবস্থায় আর বেশী দিন থাকলে, আমার ভবিষ্যৎ জীবনটা একেবারে অন্ধকার হোয়ে উঠবে! না—না, এই বেলা সময় থাক্‌তে থাক্‌তে আমি মুক্ত হোতে চাই। এ কি বন্ধন নাগপাশের মতো ক্রমশঃ আমাকে চারিদিকে জড়িয়ে ধরে আমায় প্রতি দিন অলস, অবশ, নির্জ্জীব ক'রে আন্‌ছে? সত্যই কি আজীবন আমাকে এদের এই মপ-জোপ-করা ঘর ক'খানিতে, এই হিসেব-করা আস্‌বাবগুলোর ভিতর গুণে গুণে পা ফেলে এমনি গুঁড়ি মেরে মেরেই কাটাতে হবে? এমন কি, এদের এই ওজোন-করা কথাবার্ত্তা, কেতা-দোরস্ত আচার-ব্যবহার, বাঁধা-ধরা সাজ-সজ্জা-গুলোও কি আমাকে অনুকরণ ক'রে চলতে হবে?—অসম্ভব! অসম্ভব!—এ রকম কোরে আমি বেঁচে থাকতে পারবো না!

এর মধ্যেই যেন আমার হাঁপ ধ'রছে। ইচ্ছে ক'রছে, এই বাড়ীখানাকে দু'হাতে প্রাণপণে তুলে ধরে জোর ক'রে একবার উলটে বসিয়ে দিই! একটা কিছু নতুন রকম পরিবর্ত্তন হোতে পারে তাহ'লে! কিন্তু পরিবর্ত্তন—কি নতুন,—এ সবের প্রবেশই যে এখানে একেবারে নিষেধ! একখানা চেয়ার এঘর থেকে ও-ঘরে নিয়ে গেলেই যেন এদের সর্ব্বনাশ হোয়ে যায়! একটা কিছু কোনও খানে যদি একটু নাড়া-চাড়া করে রাখি,—সমস্ত বাড়ীখানা যেন ভূমিসাৎ হ'য়ে গেছে,—এমনি কোরে ওঠে এরা সকলে মিলে! ভয়ে ভয়ে সর্ব্বদা আমি যেন আড়ষ্ট হোয়ে থাকি! একটু আলগা হোয়ে আরামে খানিকটা পায়চারি করে যে কতকটা স্বোয়াস্তি পাবো তার যো'টি নেই! নাঃ—এখানে এ ভাবে বাস করা আর আমার চলবে না।...এই প্রকাণ্ড কৌচখানা ঘরের মাঝখান থেকে সরিয়ে যদি একটু ওই দেয়ালের দিকে ঘেঁসিয়ে রাখি, তাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয় শুনি?—এই দিগ্‌-ধোড় ইজিচেয়ারটাকে দরজার গোড়া থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে যদি ওই দক্ষিণের জান্‌লাটার কাছে বসিয়ে দিই, তা' হোলে কি একটা কোনও মহাপাতক করা হয়! জড়জগতের নিয়মের মতো সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে এগুলো কি অনন্তকাল পর্য্যন্ত এই একই ভাবে একই জায়গাতে থাকবার জন্যে তৈরী হয়েছে? এগুলো কি যে যার যায়গায় সব শিকড় গেড়ে বসে গেছে না কি? স্বয়ং

ব্রহ্মা এসেও কি এসব আর নড়াতে পারবেন না ? দেখি দাঁড়াও তো—একবার নড়ানো যায় কি না—" বলিতে বলিতে নরেশ উঠিয়া কর্তার প্রকাণ্ড কৌচখানা হিড়-হিড় করিয়া টানিতে টানিতে দেয়ালের দিকে সরাইয়া দিল।

"বাঃ! এ তো নড়ে দেখছি!—আর এই মান্ধাতার আমোলের ইজিচেয়ারখানা ?" বলিয়াই সেখানাকে দুই হাতে একেবারে শূন্যে তুলিয়া ফেলিয়া বার দুই জোরে ঝাঁকানি দিয়া নরেশ একেবারে দক্ষিণের জানালার সম্মুখে সশব্দে বসাইয়া দিল।

"আচ্ছা, ওই পাথরের টেবিলটা কি ওঘরে যাবার এই সোজা পথটা আট্‌কে চিরকাল ওইখানে হাতীর মতো চার পা মেলে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে ? রোসো—ওটাকেও আজ হঠিয়ে দিই ওখান থেকে ; নইলে আমার চলা-ফেরার ভয়ানক অসুবিধে হয়।"

সশব্দে পাথরের সেই মস্ত টেবিলটা টানিয়া একপাশে সরাইয়া দিয়া নরেশ লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া ঘরের ভিতর পায়চারি করিতে করিতে বলিতে লাগিল—"আঃ! একটু হাত-পাগুলো নেড়ে যেন বাঁচলুম! আমার তো মনে হচ্ছিল, হয় ত বা চলতেও বুঝি ভুলে গেছি! আজ প্রায় এক বছর হোতে চললো—আমি এ বাড়ীতে কারুর পায়ে চলার একটু শব্দ পর্য্যন্ত কোন দিন শুনতে পাইনি! কারুর একটু উঁচু গলা এক দিনও শুনিনি। কেবল ফিস্‌ ফিস্‌ করে বিনিয়ে বিনিয়ে কথা, আর এক-আধবার মুচ্‌কে

মুচ্‌কে হাসি! কেউ এ বাড়ীতে কখনও প্রাণ খুলে চেঁচিয়ে হাসেও না ছাই! দেখি একবার, হাসিটা মনে আছে কি না— "হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ—হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ—!" নরেশ পাগলের মতো আপন মনে অট্টহাসি হাসিতে লাগিল।

"গানটান গুলো কি আর মনে আছে সব? হার্ম্মোনিয়মটা তো দেখছি প'ড়ে প'ড়ে ছাতা ধরে গেল! সেই যেদিন শশাঙ্ক গেছে, সেদিন থেকে এখানে তো গানবাজনাও একেবারে বন্ধ! দেখি দাঁড়াও, গাইতে বাজাতে এখনও পারি কি ভুলে গেছি?"— বলিতে বলিতে টেবিল-হারমোনিয়মের ডালাখানা খুলিয়া ফেলিয়া নরেশ দুই হাতেই বাজাইতে বসিয়া গেল। তার পর প্রাণপণ জোরে বাজ্‌নার সঙ্গে সঙ্গে গান ধরিল—

"বিঘ্ন বিপদ দুঃখ দহন তুচ্ছ করিল যারা,
মৃত্যু গহন পার হইল, টুটিল মোহ কারা;
দিন আগত ঐ—
ভারত তবু কৈ?
নিশ্চল নির্ব্বীর্য্য বাহু, কর্ম্ম-কীর্ত্তি-হীনে
ব্যর্থ শক্তি, নিরানন্দ জীবনধন দীনে
প্রাণ দাও, প্রাণ দাও, দাও, দাও প্রাণ হে
জাগ্রত ভগবান হে জাগ্রত ভগবান।"

*　*　*　*

রায় বাহাদুর, গৃহিণী, কমলা, লীলা সকলেই নরেশের গানের শব্দ শুনিয়া সেই ঘরে ছুটিয়া আসিল। রাগে কর্ত্তার দুই চক্ষু লাল, গৃহিণীর মুখখানি ভার। লীলার দৃষ্টিতে নিষেধের পরিপূর্ণ মিনতি, কেবল কমলার মুখের ভাবটা ঠিক বোঝা গেল না। কতক গোপন হাস্যের অস্পষ্ট ছায়া, কতক কৃত্রিম বিরাগের নিপুণ ছদ্মবেশ যেন একত্র সে মুখে উঁকি মারিতেছিল।

গৃহিণী বলিলেন "এ সব কি কাণ্ড ন'রেশ ?"

কমলা বলিল, "হঠাৎ আপনার জামায়ের ঘাড়ে গান চেপেছে বোধ হয়।"

কর্ত্তা বলিলেন "আমার বাড়ীটা তো যাত্রার দলের আখড়া নয় বাপু!"

নরেশ ধীরে ধীরে হারমোনিয়মের ডালাটি বন্ধ করিয়া অপ্রতিভের মতো উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আজ্ঞে না, এই হারমোনিয়মটা ঠিক আছে কি না একবার দেখ্‌ছিলুম!"

ঘরের ভিতরের কৌচ ও টেবিল চেয়ারগুলোর অবস্থা দেখিয়া গৃহিণী বলিলেন, "এগুলোও কি ঠিক আছে কি না দেখ্‌ছিলে নরেশ ?"

এতক্ষণে কর্ত্তারও সেদিকে নজর পড়িতে, তিনি ভয়ানক চম্‌কাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "তাই তো! এ কি? এগুলো সব এমন নাড়াচাড়া ক'রে রাখলে কে ?"

বিনীত ভাবে নরেশ বলিল, "আজ্ঞে, ওগুলো নাড়া যায় কি না, আমি পরীক্ষা করছিলুম।"

কর্ত্তা গিন্নী অবাক্ হইয়া বলিলেন, "নাড়া যায় কি না দেখ্‌ছিলে!—সে কি?"

কমলা তাড়াতাড়ি সেগুলা টানিয়া-টুনিয়া যথাস্থানে সাজাইয়া রাখিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতে করিতে বলিল, "হারমোনিয়মটা তো একটু বাজালেই ঠিক আছে কি না বুঝতে পারতে; তার সঙ্গে অমন গর্দ্দভরাগিণীতে গান ধরবার মানেটা কি শুনি?"

নরেশ ঘাড় হেঁট করিয়া বলিল, "গান-টানগুলো গাইতে ভুলে গেছি কি না, একবার যাচাই ক'রে দেখছিলুম।"

গৃহিণী আশ্চর্য্য হইয়া কর্ত্তাকে বলিলেন, "নরেশের কি হঠাৎ মাথা খারাপ হয়ে গেল?"

কর্ত্তা চিন্তিত ভাবে বলিলেন, "হ'তেও পারে!—হয় ত খুব সম্ভব তাই!" তার পর নরেশকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ নরেশ, বিবাহের আগেও কি তোমার মধ্যে মধ্যে এরকম হ'তো!"

নরেশ মাথা নাড়িয়া বলিল, "আজ্ঞে না। বিবাহের আগে কথনও হয়নি; আর এখনও যে সম্পূর্ণ খারাপ হোয়েছে, তা মনে করবেন না। তবে আমার ভয় হচ্ছে যে, এ ভাবে আর কিছু দিন থাকলে হয় ত মাথাটা আমার সত্যই খারাপ হয়ে যাবে!"

গৃহিণী ভীত হইয়া বলিলেন, "কেন বাবা নরেশ, তোমার এ রকম মনে হচ্ছে? এখানে কি তোমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে?"

নরেশ দ্বিধা মাত্র না করিয়া বলিল, "যথেষ্ট হচ্ছে।"

কর্ত্তা গিন্নি উভয়েই ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "সে কি! সে কি!"

নরেশ বলিতে লাগিল, "আশৈশব আমি দুর্ভাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ করিছি বটে, কিন্তু এমন পরিশ্রান্ত আর কখন হইনি। আজ আমার মনে হচ্ছে, জগতে আমার চেয়ে অসুখী বোধ হয় আর কেউ নেই!"

কমলা মৃদু হাসিয়া বলিল, "তাই না কি! এখনও যে এক বছরও হয়নি তোমার বিয়ে হয়েছে,—এর মধ্যেই অসুখী হওয়াটা তো সম্ভব নয়।"

গৃহিণী সস্নেহে বলিলেন, "তাই বুঝি ক'দিন থেকে বাছা আমার মুখটি শুকিয়ে বেড়াচ্ছে,—কেমন যেন মনমরা গোছ ভাব! কি হয়েছে বাবা বল'তো? লোকজনেরা কেউ কি তোমাকে অসম্মান দেখিয়েছে? খুকীর সঙ্গে কি কিছু বচসা হয়েছে,—সে কি কোনও অন্যায় করেছে? বল, লজ্জা কি, বল'না।"

নরেশ তথাপি চুপ করিয়া আছে দেখিয়া কর্ত্তা বলিলেন,

"তোমার অভাব-অভিযোগের কথা যদি আমাদের না জানাও, তাহ'লে প্রতীকার হবে কেমন করে ?"

গৃহিণী বলিলেন, "চুপ করে রইলে কেন নরেশ ?—তবে কি তোমার প্রতি আমাদের কোনও স্নেহের অভাব দেখেছো ?—তাই কি বল'তে কুণ্ঠিত হচ্ছ ?"

নরেশ আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। অস্থির ভাবে বলিল, "না মা, একটুও না। বরং এতো বেশি স্নেহ পাচ্ছি আপনাদের কাছে, যে তাতে আমার সর্ব্বনাশ হ'তে বসেছে !"

বাধা দিয়া বিরক্ত ভাবে কর্ত্তা বলিলেন, "এ কথার অর্থ কি নরেশ ?"

নরেশ বলিতে লাগিল, "আপনারা আমাকে এত বেশি আদর যত্ন করছেন যে, আমি ছেলেবেলা থেকে ওটাতে মোটেই অভ্যস্ত নই বলে' আজ একেবারে হাঁপিয়ে উঠিছি!—আরাম আর আয়েস এই দুটো সর্ব্বনেশে জিনিস এত বেশি করে আমার জন্যে এখানে বন্দোবস্ত করা হয়েছে যে, কষ্ট বা পরিশ্রম—এগুলো যে কি রকম, তা আমি প্রায় ভুলে যেতে বসিছি। আমি আমার নিজের শক্তি-সামর্থ্য ক্রমশঃ হারিয়ে ফেল্‌ছি! আমার কাজ কর্‌বার উৎসাহ চ'লে যাচ্ছে ! আমার ভয় হচ্ছে, বুঝি বা আমার জীবনের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা সব অতৃপ্ত থেকে যাবে।"

গম্ভীর ভাবে কর্ত্তা বলিলেন, "তোমার জীবনের উচ্চ আকাঙ্ক্ষাগুলোর সন্ধান পেলে, হয় তো সেগুলো সার্থক করবার একটা উপায় করতে পারা যায়।"

নরেশ উৎসাহিত হইয়া বলিল, "দেখুন, আমি চাই নিজের চেষ্টায় উপার্জ্জন ক'রে আমার পরিবার প্রতিপালন করতে,—আমি চাই সমাজে একটা মান্য-গণ্য পদস্থ ব্যক্তি হোয়ে উঠ্‌তে—আমি চাই এই কর্ম্মহীন নির্জ্জীব কুঁড়েমির বাইরে গিয়ে একটা কার্য্যক্ষম জীবন্ত মানুষ হ'তে!"

কর্ত্তা হোঃ হোঃ শব্দে হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, "এ যে তোমার নিতান্ত আহাম্মুকের মতো খেয়াল নরেশ?—একেই বলে সেই সুখে থাকৃতে ভূতে পাওয়া!"

গৃহিণী কর্ত্তাকে চোখে কি একটা ইসারা করিয়া বলিলেন, "আহা, শোনই না ছাই সবটা আগে,—ওর মনের ইচ্ছেটা কি,—ও কি হ'তে চায় জেনে, সেই ভাবে ওকে তোমার সাহায্য করা উচিত। পাঁচপাঁচটা পাশ করেছে ও,—কেন হবে না শুনি?" নরেশের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বল তো বাবা, তোমার কি হ'তে সাধ যায়। হাইকোর্টের উকীল হবে, না শ্বশুরের মতো সদরআলা হাকিম হবার ইচ্ছে আছে?"

তার পর আবার স্বামীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "ও যা হ'তে চায়, তোমাকে তাই করে দিতে হবে, বুঝ্‌লে? নরেশ আজ শুধু

আমাদের জামাই নয়—ও আমাদের শশাঙ্কর অভাব ভুলিয়ে রেখেছে।"

কথাটা শুনিবামাত্র কমলার সর্ব্বশরীরে যেন একটা বিদ্যুৎ-প্রবাহ বহিয়া গেল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ আত্মসম্বরণ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "আপনাদের জামায়ের যে রকম কল্পনার দৌড়, তাতে 'কবি' হওয়াই ওঁর পক্ষে সবচেয়ে সুবিধে।"

নরেশ বলিল, "আমার এক বন্ধু মেদিনীপুরে ওকালতি করছে। এর মধ্যেই তার বেশ পসার হ'য়েছে। সে বলছিল আমাকে উকীল হতে—"

কমলা চোখ দুইটা কপালে তুলিয়া বলিল, "সর্ব্বনাশ! তাহলে যে তোমাকে সেইখানে গিয়েই থাকৃতে হবে! এখান থেকে তো মেদ্নীপুরে ওকালতী করা পোষাবে না!"

নরেশ হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমার উকিল হবার ইচ্ছে নেই। পয়সার জন্যে যে কাজে মিথ্যাকেও সত্য বলে প্রমাণ করবার চেষ্টা করতে হবে, সে রকম নীচ উপজীবিকা আমি গ্রহণ করতে চাই না।"

কর্ত্তা শুনিয়া বলিলেন, "কাজটাকে যতটা খাটো ঠিক করেছ নরেশ, ওটা ততটা খেলো নয়। ন্যায় বা সত্যের প্রতিষ্ঠাও উকীলের সাহায্যেই হতে দেখিছি আমি।"

নরেশ তাহা স্বীকার করিয়া বলিল, "হ্যাঁ, এক পক্ষে সেটাও

ঠিক বটে। দেখুন,—আমাদের কলেজের প্রিন্সিপ্যাল সেদিন আমাকে প্রোফেসার হবার জন্যে অনুরোধ ক'রছিলেন। আপনি কি বলেন ?"

কর্ত্তা উত্তর দিবার আগেই গৃহিণী বলিলেন, "তাই বা কি করে হবে নরেশ ? তাহ'লে যে তোমাকে কলকাতায় গিয়ে থাকতে হবে !"

নরেশ বলিল, "সে তো যেতে হবেই মা ! আমি যদিও প্রোফেসার হতে ইচ্ছে করিনি, কিন্তু আজকালের মধ্যেই যে কলকাতায় চলে যাবো, সেটা একরকম ঠিক করে ফেলিছি !"

কথাটা শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "সে কি ! কলকাতায় চলে যাবে কেন ?"

কর্ত্তা বলিলেন, "প্রোফেসারি কাজটা বেশ সাধু কাজ বটে, কিন্তু উপার্জ্জনের দিকটা নেহাৎ অল্প। তা সে যা হয় পরে ঠিক করা যাবে। এখন বেলা হয়েছে। যাও, আগে নেয়ে খেয়ে নাও।"

গৃহিণী নরেশের কাছে সরিয়া গিয়া চুপি চুপি বলিলেন, "হাঁা বাবা, বলি কিছু দেনাপত্র নিয়ে জড়িয়ে পড়োনি তো ? হঠাৎ কলকাতা যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছো কেন, আমায় সব খুলে বল না—ভয় কি ;—আমি সব মিটিয়ে দেবো অখন।"

নরেশ মৃদু হাসিয়া বলিল, "না মা, আপনাদের আশীর্ব্বাদে

আমি ঋণের দায় থেকে অনেক দিন মুক্তি পেয়েছি। সে সব কিছু নয়। আমি কলকাতায় গিয়ে একটা কিছু ব্যবসা করবো ঠিক করছি!"

কর্ত্তা সে ঘর হইতে চলিয়া যাইতেছিলেন। নরেশের ব্যবসার কথাটা কাণে আসিতেই দরজার নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—"নাঃ—এটাকে দেখ্‌ছি আর খেয়াল বলাও চলে না,—এ একেবারে নিছক্ পাগলামী! ব্যবসা করবে কি হে, ও কি ভদ্রলোকের কাজ! যাও, যাও, চট্ করে নেয়ে খেয়ে নিয়ে ব'সে একঘুম দাও গে, মাথাটা ঠাণ্ডা হবে তাহ'লে।"

নরেশ উত্তেজিত ভাবে বলিল, "আমার মাথার ভেতর যে আগুণ জ্বলছে—এ সহজে ঠাণ্ডা হবে না। যত দিন যাচ্ছে, ততই যেন সে আগুণের জ্বালা বাড়ছে!—আমি কাজ চাই—কাজ চাই—এখানে এমন নিশ্চেষ্ট নিরুপায় বসে বেঁচে থাকতে পারবো না। আমি এ হাত-পাগুলোকে খাটাতে চাই। মনটারও একটা খোরাক চাই। আমার অন্তরের আশা আকাঙ্ক্ষাগুলোর একটা স্বাভাবিক নিবৃত্তির পথ খুঁজে নিতে চাই। এই কয়েদ-খানার মতো বাড়ীটাতে আদবকায়দার হাতকড়ি পরে এ ভাবে আটক্ হোয়ে থাকা আর আমার সহ্য হচ্ছে না।"

কথাটা শুনিয়া কর্ত্তার ও গৃহিণীর মুখ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিল। কমলা কিন্তু হাসিমুখেই বলিল, "শ্বশুরবাড়ীটাকে যখন

কয়েদখানা বলে মনে হ'চ্ছে ঠাকুরজামাই, তখন তোমার মনের অবস্থা যে খুবই খারাপ, এটা আমাদের নিশ্চয়ই স্বীকার করতে হবে। তা কিসের ব্যবসা করবে মনে করছো? ধান চালের না গুড় পাটালীর?"

গৃহিণী বলিলেন—"তা, বাছা, কাজ-কর্ম্মই যদি করতে চাও, তো এইখানেই কেন একটা কিছু কারবার ফেঁদে বোসো না?"

কর্ত্তা বলিলেন, "সে কিছু মন্দ কথা নয়। তোমার মনের অবস্থা যখন এ রকম, তখন একটা কিছু কাজে লেগে যাওয়াই উচিত। তা তুমি এক কাজ কর না,—আমার জমীদারিটাই না হয় দেখা-শোনা কর না। কিম্বা যদি একান্তই কোনও কারবার করবারই ইচ্ছেটা বেশি থাকে, তা'লে তাইতেই লেগে যাও, মূলধন যা লাগে আমি দোবো। তোমার কাজ করবার এই ঝোঁকটাকে আমি বন্ধ ক'রে দিতে চাইনি—ওটা খুব ভালো। সে ছোঁড়াটা ছিল কিন্তু—ঠিক তোমার উল্টো; কাজের নাম শুনলে ভয় পেতো! তা যাক্, আর গোলমাল কোর না—আমি শিগ্গিরই দেখে শুনে তোমায় যা হোক্ একটা কাজে লাগিয়ে দিচ্ছি—তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকো।"

নরেশ মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল—"কিন্তু তা'হলে তো আমি স্বাধীন ভাবে কাজ করতে পারবো না! সে যে সকল রকমে আমাকে আবার আপনারই অধীন হোয়ে থাকতে হবে!

আমি কারুর সাহায্য নিয়ে কাজ আরম্ভ করতে চাই না। আমি নিজে স্বাধীন ভাবে আপনার পায়ের ওপোর ভর দিয়ে দাঁড়াতে চাই।"

"মূলধন পাবে কোথায় ?"

"নিজের পরিশ্রমে উপার্জ্জন ক'রে নেবো। না পারি, কারুর কাছ থেকে আপাততঃ কিছু টাকা ধার করে নেবো। ধরুন আপনার কাছ থেকেই যদি চাই, তাহ'লে কি কিছু টাকা ধার পেতে পারি না ?"

"একটী পয়সাও নয়।"

"কেন ?"

"আমার ইচ্ছে ; আমি তোমাকে ধার দেবো না।—কেন জানো ?—আমি চাই, আমার জামাই ঠিক জামায়ের মতই বাড়ীতে থাক্‌বে। আমি ইচ্ছে করি না যে, আমার মেয়ে কোনও ফিরিওয়ালা দোকানদার, কোনও চাকুরে কেরাণী, কি কুলি মজুর কিম্বা পেশাদার উকিল মুহুরীর স্ত্রী বলে পরিচিত হয়।"

"স্বাধীন উপজীবিকা কি আপনি পছন্দ করেন না ?"

"পরাধীন দেশে পরাধীন জাতের আবার স্বাধীন উপজীবিকা কি ? কথাটা শুনলে আমার হাসিও পায়, রাগও হয়। চোখের সামনে তো দেখ্‌তে পাচ্ছি—'স্বাধীন উপজীবিকা' বলে একটা লম্বা-চৌড়া ভড়কানো গোছের নাম দিয়ে করছে তো সবাই

একটু ভদ্ররকমের ভিক্ষে!—একএকখানা বড় বড় সাইন-বোর্ড ঝুলিয়ে হাঁ করে হাত পেতে খদ্দেরের মুখ চেয়ে বসে আছে!"

"বলেন কি? ব্যবসায়ীদের আপনি ভিক্ষুকের দলে ফেলছেন? ও কথা বল্‌লে তাদের অপমান করা হয়।"

"কিছুমাত্র নয়। ব্যবসার প্যাঁচওয়া ফন্দী আর ঘোরালো জুচ্চুরীর চেয়ে বরং সোজা-স্বজি ভিক্ষে করা ঢের ভালো। তাতে অন্ততঃ লোককে ঠকানোর পাপটা এড়ানো যেতে পারে।"

"সে কি! ব্যবসা করাটাকে জুচ্চুরী বল্‌ছেন?"

"জুচ্চুরী নয় ত কি?—পাঁচ টাকায় কেনা জিনিসটা তুমি পাঁচজনকে ডাহা ঠকিয়ে আট টাকায় গছাতে পারলে তবে তো দুপয়সা লাভ থাবে? তাহ'লেই দেখ না কেন, ওটা জুচ্চুরী ঠগবাজী হোল না কি? কি জানো—ব্যবসাটা হচ্ছে ঠিক্ 'লাইসেন্স'-নেওয়া চুরি আর কি! প্রকাশ্য ভাবে সর্ব্বত্রই চল্‌ছে,—কেবল লাইসেন্সের জোরে 'পেনাল কোডের' ধারাগুলো এড়িয়ে যায়!"

"এ ভাবে বিচার করলে তো কোন কাজেই হাত দেওয়া চলে না দেখ্‌ছি!"

"তোমার দরকার কি বাপু হাত দিয়ে? তুমি রাজনগরের একটা পুরোনো বনেদী বড়লোকের ঘরে একটা সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়েকে বিবাহ করেছো—যাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কেউ কখন কুলি

মজুরের মতো কেরাণীগিরী, মাষ্টারী কি মোক্তারী করেনি। চিরকাল পায়ের ওপোর পা দিয়ে বসেই কাটিয়েছে,—নয় তো বড় জোর—হাকিম হ'য়ে হুকুম চালিয়েছে। তুমি আর কিছু পারো আর না পারো, অন্ততঃ তোমার স্ত্রীর পিতৃকুলের মানসম্ভ্রম, তাদের বংশমর্য্যাদাটা বজায় রেখে চলো। তুমি এম্-এ, বি-এ পাশ করেছো বটে, কিন্তু ও পাঠশালার ছাপ দেখে কেউ তোমাকে আমার চেয়ে বেশি খাতির করবে না—এটা তুমি নিশ্চয় জেনো। অথচ কাল যদি তুমি আমার জমীদারী হাতে নাও, দেখ্‌বে, রাস্তায় বেরুলে দুধারি লোক তোমাকে সেলাম করছে! এত বড় যে ইংরেজ গভর্মেণ্ট এরাও ডেকে উপযাচক হোয়ে আমাদের খেতাব দেয়।"

"কিন্তু, আমি যে পরের ময়ূরপুচ্ছ নিয়ে বড় হতে চাই না—সেটা আপনি ভুলে যাচ্ছেন।"

"তুমি দেখ্‌ছি একটী আস্ত গাড়োল! যেটাকে পরের ময়ূরপুচ্ছ বলে মনে করছো, সেটাতে যে তোমার এখন একটা ন্যায্য অধিকার জন্মেছে—সেটাই বা তুমি ভুলে যাচ্ছো কেন?—আমার যে এখন ঐ এক মেয়ে ছাড়া আর কেউ নেই! দুদিন বাদে যা সম্পূর্ণ তোমার নিজের হবে, আজ সেটাকে পরের জিনিস বলে তুচ্ছ করাটা যে তোমার আর একটা প্রকাণ্ড আহাম্মুকীর পরিচয় দেওয়া হচ্ছে।"

"স্ত্রীর প্রাপ্য সম্পত্তি দখল করে সম্ভ্রান্ত সাজাটাকে আমি অতি নীচ দীনতা মনে করি!"

"তোমার কথাগুলো বড্ড বেশি কড়া হ'য়ে পড়ছে। তুমি একটু সংযত হ'য়ে কথা কইলে আমি বড় বাধিত হব।"

শ্বশুর ও জামাতার কথাবার্ত্তা ক্রমেই কলহে পরিণত হইবার উদ্যোগ হইতেছে দেখিয়া, গৃহিণী তাড়াতাড়ি স্বামীর সন্নিকটে আসিয়া বলিলেন, "ওগো, থাক্ থাক্—তুমি আর বেশি তর্ক বিতর্ক কোর' না। তর্ক করলেই তোমার মাথা গরম হ'য়ে ওঠে।" জামাতাকে বলিলেন "বাবা নরেশ, আর তর্কে কাজ নেই, ডাক্তারেরা তোমার শ্বশুরকে তর্ক করতে বিশেষ করে নিষেধ করেছেন। উনি যা বলছেন শোনই না কেন। উনি তোমার গুরুজন, তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী। ওঁর কথা শুনে চললে তোমার ভালই হবে।" মেয়েকে বলিলেন, "খুকি, যা তো মা, ওঁর সর্ব্বতের গেলাসটা এনে দে তো—বকে বকে ওঁর গলা শুকিয়ে গেছে।"

কমলা বলিল "চল ঠাকুরজামাই—খাবে চল, সকাল থেকে এক পোড়া তর্ক জুড়ে অনেক বেলা করে ফেল্‌লে!"

নরেশ গম্ভীর হইয়া বলিল, "আমার ক্ষিধে নেই! আমি আজ আর কিছু খাবো না।"

গৃহিণী নরেশের ভাবগতিক দেখিয়া তাহার নিকটে আসিয়া

স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলিলেন, "ছিঃ বাবা, রাগ করতে আছে কি, চল খাবে চল।"

নরেশ উত্তেজিত ভাবে বলিল, "এ বাড়ীতে আমি আর জলস্পর্শ কোরবো না!"

লীলা ঠিক সেই সময় কর্ত্তার সর্ব্বতের গেলাসটি হাতে করিয়া ঘরে ঢুকিতেছিল। নরেশের কথাটা কাণে আসিতেই সর্ব্বৎ-ভরা কাঁচের গেলাসটা তাহার হাত হইতে মেঝেয় পড়িয়া গিয়া চুরমার হইয়া গেল। হঠাৎ গেলাসটি ভাঙিয়া যাওয়ার শব্দে সকলেই একটু চম্‌কাইয়া উঠিল। কমলা ও গৃহিণী 'আহা হা!' করিয়া উঠিলেন। কর্ত্তা একবার করুণনেত্রে সেদিকে চাহিয়া বলিলেন, "যাক্‌গে—ওখানটা সাফ করিয়ে ফেল। উঃ! ভারি গরম বোধ হচ্ছে! জানালার সার্শীগুলো সব খুলে দাও কেউ।" বলিয়া খবরের কাগজখানা ভাঁজ করিয়া লইয়া নাড়িতে নাড়িতে বাতাস খাইতে সুরু করিলেন।

কমলা তাড়াতাড়ি গিয়া সার্শীগুলা খুলিয়া দিতে লাগিল। গৃহিণী একখানা পাখা আনিয়া বাতাস করিতে লাগিলেন।

লীলা তখন ঘরের মেঝের নতজানু হইয়া শতখণ্ড কাঁচের গেলাসের টুক্‌রাগুলা হেঁট মুখে কুড়াইতেছিল, আর নরেশ নিতান্ত নির্লজ্জের মত একদৃষ্টে তাহাই দেখিতেছিল।

পাখার বাতাস করিতে করিতে গৃহিণী কর্ত্তার কপালে হাত

দিয়া দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওমা, তাই তো গো! ঈস্! এ যে বড্ড ঘেমেছো দেখ্ছি! রোসো, একখানা তোয়ালে এনে মুছিয়ে দিই; বৌমা! তুমি বাছা আর এক গ্লাস সর্ব্বৎ তৈরি ক'রে আনো—বকা-ঝকা ক'রে তোমার শ্বশুর বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।"

কর্ত্তা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "না—না, আর আনতে হবে না, কিন্তু এ কি? সকল বিষয়েই তর্ক! যা বলি তারই একটা উল্টো জবাব! এ রকম তো জীবনে কখনো আমি দেখিনি! আমার মুখের ওপর ত আজ পর্য্যন্ত কাউকে জবাব দিতে শুনিনি!"

গৃহিণী তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন, "যাক্‌গে। ছেলেমানুষ অতশত জানে না, কথার পিঠে দু'কথা ক'য়ে ফেলেছে। ও তো এখনও তোমার ধাত ঠিক্ বুঝতে পারেনি! তাছাড়া আজ ক'দিন থেকেই ওর মনটাও একটু যেন খারাপ হ'য়ে রয়েছে—নারে খুকী?"

লীলা সলজ্জভাবে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল "হ্যাঁ।"

গৃহিণী উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন বল্ তো মা? তুই কিছু জানিস?"

লীলা নীরবে ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল।

গৃহিণী পাখাখানা রাখিয়া মেয়ের নিকট উঠিয়া গিয়া অনুনয়

করিয়া বলিলেন, "খুকী, কি জানিস্ সব খুলে বল আমার কাছে—লুকোস্নে কিছু।"

"আমি তো তা কিছু জানি না মা!" বলিয়া লীলা তাহার উদ্গত অশ্রুজল গোপন করিবার জন্য ভাঙা কাঁচের টুক্‌রাগুলা জানালা দিয়া ফেলিয়া দিতে গেল, কিন্তু তাহার চক্ষের জল কমলার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে এড়াইতে পারিল না। কমলা তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিল, "এ কি! কাঁদছিস কেন ভাই? কি হ'য়েছে?" গৃহিণীও সত্বর নিকটে আসিয়া বলিলেন, "তাই তো, কাঁদছিস্ যে! কি হয়েছে মা?"

কর্ত্তা একবার কন্যার অশ্রুনিসিক্ত মুখের দিকে ফিরিয়া দেখিয়া জলদগম্ভীর কণ্ঠে হাঁকিলেন "নরেশ! কি বলেছো তুমি ওকে? ও যে কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে?"

গৃহিণীও জামাতার দিকে বিরাগপূর্ণ দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিলেন, "নিশ্চয় একটা গুরুতর কাণ্ড হ'য়েছে,—নইলে ও তো সহজে কাঁদে না!"

লীলা তাড়াতাড়ি চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল—"কই, এই তো আমি তো আর কাঁদ্‌ছি না।"

কমলা হাসিয়া ফেলিয়া তাহার গালে একটী টোকা মারিয়া বলিলল, "পোড়ারমুখী! এই মাত্র কাঁদ্‌ছিলি, আর বলছিস কাঁদিনি!"

নরেশ কঠোর বিদ্রূপের সহিত বলিয়া উঠিল, "এক ফোঁটা চোখের জল দেখে যার জন্যে আজ বাড়ীশুদ্ধ আপনারা অস্থির হোয়ে উঠেছেন, তার যা কিছু দুঃখ সব কিন্তু আপনাদেরই অনুগ্রহে! বোধ হয় এখন থেকে ওকে রোজই চোখের জল ফেল্‌তে হবে!"

নরেশের কথা শুনিয়া সকলে সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নরেশ কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিতে লাগিল, "দেখুন, আজ যখন কথাটা উঠেছে, তখন সব পরিষ্কার ক'রে বলাই ভালো। আমার মনে হয়, আমাদের এ বিবাহ বড় অশুভক্ষণেই হয়েছে। আমরা কেউই পরস্পরের যোগ্য নই। স্বামী-স্ত্রীর মিলনের যেটি প্রধান বন্ধন, আমাদের উভয়ের মধ্যে সেই বস্তুটিরই একান্ত অভাব দেখতে পাচ্ছি!"

উত্তেজিত ভাবে গৃহিণী বলিলেন, "নরেশ!—কি বল্‌ছো তুমি এ সব?"

কর্ত্তা তাঁহাকে ধমক দিয়া বলিলেন, "তুমি থামো। ব্যাপারটা কি আমাকে ভালো ক'রে বুঝতে দাও। হ্যাঁ, কি বলছিলে নরেশ?"

নরেশ নির্ব্বিকার কণ্ঠে উত্তর দিল, "আমাদের স্বামী স্ত্রীর মিলনের মধ্যে প্রেমের পবিত্র বন্ধন স্থাপিত হয়নি।"

কর্ত্তা বিস্ফারিত নেত্রে নরেশের আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ

করিতে লাগিলেন। গৃহিণী কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন, "লীলা! নরেশ যে তোকে নিয়ে সুখী হ'তে পারেনি, এ কথা এত দিন কেন আমাদের কাছে বলিস্‌নি খুকী?"

লীলা কোনও উত্তর দিবার আগেই নরেশ বলিল, "এ ক্ষেত্রে অপরাধী ও নয় মা, অপরাধী আমি। আমিই ওর মনের মতো হতে পারিনি বোধ হয়, তাই ও আমাকে সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করতে পারেনি!"

গৃহিণী চিন্তিত মুখে মেয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"হ্যাঁরে, নরেশ যা বলছে, যদি যথার্থই অবস্থাটা তাই হয়ে থাকে, তবে তো—"

বাধা দিয়া নতমুখে লীলা বলিল, "উনি তাই মনে করেন মা। কিন্তু আমার মুখে তোমরা কি এক দিনের জন্যেও ও রকম কোনও কথা শুনেছো?"

বিজ্ঞের মতো গম্ভীর ভাবে নরেশ বলিল, "দেখুন, ওর মনের এখনও সম্পূর্ণ পরিণতি হয়নি। ও নিজেই হয়তো জানে না যে কি ওর অভাব, কোথায় ওর ত্রুটী। আর জানতেও বোধ হয় কোন দিন পারবে না, যদি ওকে চিরকাল ওর এই পিতৃগৃহের অসংযত আদরের অন্তরালে এমনিই দায়িত্বহীন জীবন যাপন করতে হয়।"

কর্ত্তা তাঁহার চশমাখানা খুলিয়া কোঁচার কাপড়ে বেশ করিয়া মুছিয়া লইয়া আবার চক্ষে দিয়া বলিলেন, "অর্থাৎ—?"

নরেশ বলিতে লাগিল—"পিতামাতা ছাড়া এখন আরও একজনের প্রতি যে ওর একটা বড় রকম কর্ত্তব্য রয়েছে, পিতামাতার চেয়েও যার দাবী ওর ওপোর এখন সব থেকে বেশি—সেই সহজ শিক্ষাটাই ওর এখানে থাকলে কোন দিনই হবে না। ও তার স্বামীকে নিজের বড় ভা'য়ের চাইতে আর অধিক কিছু মনে করে না। ও জানে ওর যে স্বামী, সেও ওরই মতো চিরকাল এখানে থেকে ওর পিতামাতার আনন্দ বর্দ্ধন করবে এই মাত্র!"

কমলা মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—"সেটা বুঝি তুমি একেবারেই ইচ্ছে কর না?"

নরেশ উত্তেজিত ভাবে উত্তর করিল, "ইচ্ছে থাকলেও সেটা করা আমি বিধেয় মনে করি না। ওর সঙ্গে আমার সম্বন্ধের যেটা পরম বন্ধন, সেটা ও যে আজও হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি। আমি এখানে থাকি বা চলে যাই, তাতে ওর কিছুই আসে যায় না। ও চিরকাল এখানে ওর পিতামাতার স্নেহনীড়ে আদরে থাকতে পেলেই চরিতার্থ হবে মনে করে। ওর নিজের কোনও স্বাধীন ইচ্ছে নেই, কোনও আশা আকাঙ্ক্ষা নেই, কোনও সাধ আহ্লাদ নেই! ওর পিতামাতার যা অভিরুচি, ওরও অবিকল তাই। আমাকে ভুলেও ও কখন কোনও অনুরোধ করে না। কোনও দিন ওর মনের কোনও সাধ, কোনও বাসনা—ও আমার কাছে

জানায়নি। আজ পর্য্যন্ত ওর কাছে আমি একটা কোনও উচ্ছ্বসিত সোহাগের বাণী শুনতে পাইনি। ওর যত কিছু স্নেহ-ভালবাসা-ভক্তি-অনুরাগ সমস্তই যেন একমাত্র এঁদের দুজনেরই একচেটে সম্পত্তি! আর কারুর তাতে বিন্দুমাত্রও অধিকার নেই বোধ হয়।"

গৃহিণী এক গাল হাসিয়া বলিলেন, "ওগো, শুন্‌ছো?—লিলি আমাদেরই সব চেয়ে বেশি ভালবাসে বলে নরেশের ভারি রাগ হয়েছে।"

কর্ত্তাও সহাস্য মুখে কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁরে খুকী?—তুই আমাদের সব থেকে ভালোবাসিস বলে কি নরেশ রাগ করে?"

লীলা সলজ্জ ভাবে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। রায় বাহাদুর চেয়ার হইতে উঠিয়া পড়িয়া উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন "এঃ নরেশ! তুমি দেখ্‌ছি নেহাৎ ছেলেমানুষ! এর জন্যে কি এত রাগারাগি করতে আছে? লোকে শুন্‌লে যে তোমায় ভারি ঠাট্টা করবে!"

নরেশ তখন অধিকতর গম্ভীর হইয়া বলিতে লাগিল, "দেখুন, এ ছেলেমানুষী নয়, আর এ ব্যাপারটা এমন হেসে উড়িয়ে দেবার মতোও নয়। আমাদের দুজনের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর যে সম্বন্ধ স্থাপিত হ'য়েছে—তার স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তার পক্ষে ঐ জিনিসটাই আজ

প্রধান অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে! তাই আমি ওটাকে আর মোটেই সহ্য করতে পার্‌ছি না।"

কর্ত্তা নরেশের পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, "তাহ'লে দেখছি নিশ্চয় তোমার মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে বাবাজী!"

নরেশ বলিল, "তা হ'তে পারে—কিন্তু সে জন্যে আপনারাই সম্পূর্ণ দায়ী।"

কথাটা শুনিয়া কর্ত্তার মুখখানি গম্ভীর হইয়া উঠিল। তিনি আবার চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া বলিলেন—"কি রকম?"

নরেশ বলিতে লাগিল—"আপনারা যেন আমাকে এখানে একটা কলের পুতুলের মতো করে রেখেছেন—আমি যেন আপনাদের আদুরে মেয়ের একটা খেলনার সামিল! সে যদি ভুলেও কোন দিন আমাকে তার চেয়ে একটু বেশি কিছু মনে করে, সেটা বোধ হয় আপনারা কেউই সহ্য করতে পারবেন না।"

কর্ত্তা রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন, "নরেশ, তুমি একটু সংযত হোয়ে কথা কও!"

ননেশ হাত জোড় করিয়া বলিল, "আজকের মতো আমার বেয়াদবিটুকু আপনারা মাপ করবেন। আমি আজ খোলাখুলি গোটাকতক কথা বল্‌তে চাই। আমার বক্তব্য আর কিছু নয়,—আমি শুধু আপনাদের জানাতে চাই যে, পিতামাতার স্নেহচ্ছায়ায়

চিরদিন পরিবৃত থাকলে কোন বালিকাই তার স্বামীর যথার্থ পত্নী হবার যোগ্যতা লাভ করতে পারে না। এই দায়িত্বহীন বেষ্টনের মধ্যে বন্দিনী হ'য়ে থাকলে, এও বোধ হয় কোন দিনই যাকে বলে প্রকৃত গৃহলক্ষ্মী, সংসারের কর্ত্রী, পতির সহধর্ম্মিণী বা স্বামীর জীবনসঙ্গিনী—তা হোয়ে উঠ্‌তে পার্‌বে না। চিরকাল এম্‌নি-তর এক অবোধ বালিকাই থেকে যাবে!"

কমলার চোখে মুখে একটা দুষ্ট হাসি ফুটিয়া উঠিল। সুস্পষ্ট বিদ্রূপের ঝঙ্কার দিয়া সে বলিল, "তবে যে বল্‌তে—ওর এই ছেলেমানুষীটুকুর জন্যেই লীলাকে তোমার সব চেয়ে বেশি মনে ধরেছে?"

নরেশ ইহাতে কিছুমাত্র লজ্জিত না হইয়া উত্তর দিল—"সে কথা আমি এখনও অস্বীকার করছি না বৌদি! ওর ওই বালিকা-সুলভ স্বভাব যথার্থই আমাকে মুগ্ধ করেছে—ওর ওই শান্ত স্নিগ্ধ সরলতা আমাকে যেন এক অপূর্ব্ব আনন্দ কিরণে অভিষিক্ত করে দিয়েছে! ওর অনাবিল সঙ্গ, অকলুষ স্পর্শ যেন নির্ম্মল উষা-লোকের মতো আমার দেহ মন উজ্জ্বল ও পবিত্র করে দিয়েছে! ও যেদিন হাসিমুখে আমারই গলায় তার বরমাল্যখানি পরিয়ে দিলে, সেদিন আমি ওকে পেয়ে আমার জীবন ধন্য মনে করিছিলুম; আমার জন্ম সার্থক হ'ল ভেবেছিলুম! জগতের যা কিছু সৎ, যা কিছু মহৎ,—যা কিছু কল্যাণকর,—তারই মূর্ত্তিমতী ছায়ার

মতো ও সেদিন আমার অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করেছিল! ওর অনিন্দ্যসুন্দর মূর্ত্তিখানি সেদিন বিকশিত শতদলে কমলার কনক-প্রতিমার মতো আমার চক্ষে যেন মহামহিমময়ী হ'য়ে প্রকাশ পেয়েছিল! কিন্তু আজ আর আমাদের মধ্যে কোন দূরত্ব নেই। আজ আমি ওর একান্ত নিকটতম আত্মীয় হ'য়ে শুধু ওকে প্রশংসার চক্ষে দেখেই পরিতৃপ্ত হ'তে পার্‌ছি না!—আমি চাই যে সেও আজ আমাকে তার অনির্ব্বচনীয় প্রেমে অভিষিক্ত ক'রে নিক। আজ আর আমি শুধু প্রতিমার সম্মুখে অর্চ্চকের আসন অলঙ্কৃত করে নির্ব্বিকার বসে থাকতে পার্‌ছি না; আজ আমি চাই যে ওর অন্তরের যতকিছু সুপ্ত ভাবরাশি জাগ্রত ও জীবন্ত হ'য়ে উঠে আমার হৃদয়ের সকল চিন্তাকে পরিবেষ্টন করে নিয়ে তাকে তৃপ্ত করে দিক্—শান্ত করে দিক্।—আমার এ দুঃখদগ্ধ জীবন আজ সেই মহামিলনের আনন্দ কিরণে উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক! জন্মার্জ্জিত অভ্যাস ও সংস্কারের দোষে যে আকর্ষণটা আজ তার মনে প্রবল হোয়ে উঠে আমাকে তার কাছ থেকে দূরে রেখে দিয়েছে—আমি নিষ্ঠুরের মতো সেটাকে চূর্ণ করে দিয়ে আজ আমাদের দু'জনের মধ্যে সব ব্যবধান দূর করে ফেল্‌তে চাই!"

গৃহিণী চুপি চুপি কর্ত্তার কাণে কাণে বলিলেন, "জামাই দেখ্‌ছি মেয়েটাকে খুবই ভালবাসে!"

কর্ত্তা গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িয়া জানাইলেন "হুঁ, কিন্তু

ছোক্‌রার দেখ্‌ছি মাথার গোলমালও একটু আছে। বড় নির্লজ্জ বেহায়ার মতো যা-তা আমাদের সাম্‌নে বলছে।"

গৃহিণী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আজকালকার ছেলেরা যে লঘু-গুরু মানে না গো!"

লীলা ধীরে ধীরে জননীর নিকট আসিয়া বলিল, "মা আমার নতুন নেকলেস্‌টা বার ক'রে দিও, চারু বাবুর ওখানে আমি একলাই যাবো মনে করছি। এই নিয়ে যখন এত রাগারাগি —তখন তুমি না যেতে পারলেও আমাকে অন্ততঃ যেতেই হবে দেখছি!"

কমলা কথাটা :শুনিতে পাইয়া লীলার পিঠে একটি ছোট চাপড় মারিয়া বলিল, "আঃ, বাঁচালি ভাই!—"তার পর নরেশের কাছে আসিয়া বলিল, "তোমাদের উনি নেমন্তন্ন যেতে রাজি হয়েছেন, এইবার সব গোল মিটলো তো?—নাও,—এখন চল, নাইবে খাবে চল—"

নরেশ সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না—না, এ শুধু নেমন্তন্ন যাওয়া না যাওয়ার কোনও কথা নয়,—এটা তার চেয়েও ঢের গুরুতর কথা। নেমন্তন্ন যেতে চা'ক্‌ বা না চা'ক্‌, তাতে আমার কিছু যায় আসে না।"

লীলা মুখখানি ভার করিয়া জননীর দিকে ফিরিয়া বলিল, "দেখলে তো মা! যেই রাজি হলুম, অম্‌নি বল্‌লে যাক্‌ না যাক্‌

তাতে কিছু যায় আসে না! এ কি রকম বল তো! উনি যখন যা চান, যেই কিন্তু সেটা করা হয়—অম্‌নি বলেন—'আমি তো তা বলিনি!' তখন আবার ঠিক উল্টো আর একটা কিছু ধরে বসেন!—আমি বাপু অত মন যুগিয়ে চল্‌তে পারি না!"

গৃহিণী তখন কন্যার পক্ষ লইয়া জামাতাকে বলিলেন, "নরেশ! তুমি কিন্তু বাবা আজ এই নেমন্তন্ন যাওয়া নিয়েই সকাল থেকে রাগারাগিটা বাধিয়েছো?"

নরেশ বলিল, "না মা, সে জন্যে নয়, বিবাদটা হচ্ছে আসলে—আমাদের দু'জনের যে প্রকৃত সম্বন্ধ—তারই চূড়ান্ত দাবী-দাওয়া নিয়ে!—আমি স্ত্রীর কাছ থেকে স্বামীর যা যথার্থ প্রাপ্য, তাই থেকে বঞ্চিত হ'য়ে রয়েছি। মাঝে মাঝে সৌভাগ্য ক্রমে আমি ওর কাছ থেকে যে সহানুভূতিটুকু পাই, সে যেন দীনের প্রতি দাতার করুণা ভিক্ষার মতো! নাম যশ পুণ্য বা কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে উদ্বোধিত যে কাজ, তার সঙ্গে কোন দিনই হৃদয়ের কোনও ঐকান্তিক যোগ থাকে না। আমিও তাই আজ পর্য্যন্ত ওর হৃদয়ের আন্তরিকতার কোনও পরিচয় পেয়ে ধন্য হ'তে পারিনি—আর তা বোধ হয় কখনো পার্‌বোও না—যদি না ওকে আমি শীগ্‌গির আপনাদের কাছ থেকে তফাৎ ক'রে নিতে পারি!"

গৃহিণী শঙ্কিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি তবে লীলাকে আমাদের কাছ থেকে তফাৎ করে নিতে চাও?"

কর্তা বলিলেন—"তোমার উদ্দেশ্যটা আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না নরেশ!"

নরেশ বলিতে লাগিল, "আমি চাই ওকে আমার সত্যকার স্ত্রীরূপে পেতে—আর সেটা সম্ভব হবে কেবল সেই দিনই, যে দিন ও বুঝ্‌তে পারবে যে, ও শুধু আপনাদেরই কন্যা নয়, আমার স্ত্রীও বটে। যে দিন, যে মুহূর্ত্তেও জানতে পারবে যে, আপনাদের পরিত্যাগ ক'রে গেলেও ওর দিন বেশ সুখেই চল্‌তে পারে, সে দিন সেই মুহূর্ত্তেই আমি ওর হৃদয় সম্পূর্ণ অধিকার করতে পারবো।"

বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে স্বামীর দিকে চাহিয়া গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি বল্‌ছে এ?"

পেচকের মতো দুই চক্ষু বাহির করিয়া মাথাটির সহিত উভয় হস্তই অবাকের মতো নাড়িতে নাড়িতে কর্ত্তা বলিলেন—"কি জানি! কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।"

নরেশ সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বলিতে লাগিল, "কেবল-মাত্র পিতামাতার অনুগত আদুরে মেয়ে হওয়া ছাড়া, ওকে যদি কোনও দিন পতির অনুরক্তা, স্বামীর ছন্দানুবর্ত্তিনী, সুশীলা ও সুচরিতা পত্নী হ'তে হয়, তাহ'লে এই বেলা ওকে এ বাড়ী ত্যাগ ক'রে যেতে হবে। এ ভাবে এখানে থাকলে ওর জীবন যে পথে গড়ে উঠ্‌বে, আমরা সকলেই তাতে চিরকালের জন্য অসুখী

হবো—আমি তাই সময় থাকতে ওকে আমার নিজের আশ্রয়ে সরিয়ে নিয়ে যেতে চাই।”

নরেশের মনোগত অভিপ্রায়টি যখন এমনই নিদারুণ স্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, আর তাহাতে কোন প্রকার সন্দেহ প্রকাশ করা চলে না, তখন কাতর ভাবে গৃহিণী বলিলেন, “লীলাকে ছেড়ে যে আমরা থাকতে পারবো না বাবা! ওকে যদি তুমি কেড়ে নিয়ে যাও, তাহ’লে আমরা আর বাঁচবো না!”

কর্ত্তাও এবার নরম হইয়া বলিলেন, “দেখ নরেশ, একটা কথা বলি শোনো। তুমি তো জানো, আমাদের পাঁচটি সন্তান হ’য়েছিল। কিন্তু তাদের চারটিকে একে একে ভগবান তাঁর কোলে টেনে নিয়েছেন। এখন কেবল ওই একটা মেয়েই আমাদের জীবনের সম্বল পড়ে আছে, ওকে নিয়েই কোনও রকমে আমরা বেঁচে আছি—”

ব্যাকুল হইয়া গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন, “ওকে আমরা চোখের আড়াল করতে পারবো না; আর, জন্মাবধি আমাদের ছেড়েও ও কখনও কোথাও গিয়ে এক দিনের জন্যে থাকেনি। ও কি আমাদের কাছ থেকে যেতে পারে? ও গেলে আমরা যে এ বাড়ীতে আর একদণ্ডও তিষ্ঠুতে পারবো না!”

নরেশ অবিচলিত কণ্ঠে বলিল, “কাজটা যতই কেন কঠিন ও কষ্টকর হোক্ না, এ আপনাদের করতেই হবে। আপনারা

উদ্যোগী হ'য়ে যথা সময়ে যদি না ওকে ওর নিজের গৃহে পাঠান, তা'হলে সবার বড় আত্মীয় হয়েও সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করবেন ওর আপনারাই। তাই বলছি, প্রসন্ন মনে অনুমতি দিন—আমি ওকে সময় থাকতে ওর স্বস্থানে নিয়ে যাই।"

গৃহিণী এবার কাঁদ-কাঁদ হইয়া কর্ত্তাকে বলিলেন, "ওগো, কি হবে তাহ'লে? আমি লীলিকে ছেড়ে কি করে থাকবো? তুমি নরেশকে একটু বুঝিয়ে বল না!"

কর্ত্তা তখন চেয়ার হইতে উঠিয়া নরেশের কাছে সরিয়া আসিয়া বলিলেন, "দেখ নরেশ, তোমাকে আমরা ভালো ছেলে ব'লেই জানি। আমাদের যাতে কষ্ট হবে, সে কাজ বোধ হয় তুমি কখনই করবে না।"

নরেশ হেঁটমুখে মাটির দিকে চাহিয়া উত্তর দিল, "অপ্রিয় হ'লেও কর্ত্তব্যকে অবহেলা করা চলে না। জানি, আপনাদের খুবই মনকষ্ট হবে; কিন্তু উপায় নেই। দু'দিনের জন্যে সেটুকু কোনও রকমে সহ্য ক'রে থাকতে হবে। স্নেহের বশে অন্ধ হোয়ে এটুকু স্বার্থত্যাগ করতে না পারলে, আপনাদের মেয়েরই আখের-উমের মাটি করা হবে। আমি যদি এই বেলা ওকে এখান থেকে না নিয়ে যাই, তাহ'লে আমাদের দু'জনের জীবনই চিরকালের জন্যে অসুখী হ'য়ে যাবে, আর আমাদের সে অবস্থাটা, আমি জানি, আপনাদের পক্ষেও মোটেই প্রীতিকর হবে না। তাই মিনতি

করে বল্‌ছি, আর অমত করবেন না, কাল দিন ভালো আছে, কাল আমরা আপনাদের কাছে বিদায় নিয়ে যাই।"

ক্রোধে, ক্ষোভে, অভিমানে আগুন হইয়া কর্ত্তা বলিয়া উঠিলেন—"অসম্ভব! সে হ'তে পারে না নরেশ।"

গৃহিনী বলিলেন, "আমাদের এই সর্ব্বনাশ করবার জন্যেই কি আমরা তোমার হাতে লীলাকে তুলে দিয়েছিলুম? বিয়ের আগে তো তোমার সঙ্গে এ নিয়ে একটা বোঝাপড়া হ'য়েছিল—যে লীলা আমাদের এখানেই থাক্‌বে?"

কর্ত্তা বলিলেন, "নিশ্চয়, সে কথা তখন বার বার ক'রে আমি ওকে বলিছি,—ও তখন তাতেই স্বীকার হয়েছিল; কিন্তু এখন বিশ্বাসঘাতকতা কর্‌তে চাচ্ছে! দেখ নরেশ, আমি তোমাকে এখনও ভালো করে বল্‌ছি, মিনতি করে বল্‌ছি, তোমার ও দুরভিসন্ধি ত্যাগ কর। তোমার ভবিষ্যতে যাতে ভাল হয়, তোমরা স্বামী স্ত্রী দু'টিতে আজীবন যাতে না কখন কষ্ট পাও, আমি তার সমস্ত সুবন্দোবস্ত করে রেখেছি। তবু যদি তুমি এমন অন্যায় অভদ্রতা করতে চাও, তাহ'লে জান্‌বো যে, আমরা ভুল ক'রে একজন ইতরের হাতে মেয়ে দিয়েছি। দেখ, একটা কথা বলি তোমায় শোন,—হয় ত তুমি যা ব'ল্‌ছ সব ঠিক; কিন্তু আমরা কটা দিনই বা আছি?—এ বৃদ্ধ বয়সে আর আমাদের এত বড় আঘাতটা দিয়ো না। যে কটা দিন বাঁচি—আমাদের

সুখে মরতে দাও। আমি তোমার কাছে এইটুকু ভিক্ষে চাচ্ছি। এ বংশের কেউ কখনও কারুর কাছে এতটা হীনতা স্বীকার করেনি—"

কর্ত্তার উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়া নরেশ বলিল, "আমাকে আপনারা মাপ করুন। অন্য কোন উপায় থাকলে আমি কখনই এ কাজ করতুম না ; কিন্তু আমি নাচার। হাজার অপ্রিয় হলেও এ কাজ আমাকে করতেই হবে। আজ যদি আপনাদের মুখ চেয়ে আমার সঙ্কল্প কাজে পরিণত করতে ইতস্ততঃ করি, তা'হলে জন্মের মতো আমাকে অসুখী হ'য়ে থাকতে হবে। সুতরাং লীলাকে আমি আজ কালের মধ্যে নিশ্চয়ই নিয়ে যাবো জানবেন,—এ বিষয়ে কারুর কোন আপত্তিই আমি শুনবো না স্থির করিছি।"

গৃহিণী ব্যাকুল হইয়া বলিলেন "না নরেশ, লীলাকে আমরা কিছুতেই যেতে দিতে পারবো না।"

কমলা উত্তেজিত ভাবে বলিল, "নিশ্চয়, কখনই যেতে দেবো না। কার সাধ্য লীলাকে এ বাড়ী থেকে এক পা নিয়ে যায়!"

অবসরপ্রাপ্ত হাকিম রায় বাহাদুর মুকুন্দ মজুমদারের মলিন মুখে একটা করুণ হাস্যের বিবর্ণ ছায়া দেখা দিল! মর্ম্মান্তিক হতাশের একটা বেদনাতুর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া তিনি কমলার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"সে যে হয় না মা ; লীলার স্বামী যদি তাকে এখানে রাখতে অসম্মত হয়—তাহ'লে জোর করে তাকে এখানে

ধ'রে রাখবার আমাদের কোন আইনসঙ্গত অধিকার নেই! নরেশের সঙ্গেই ওকে যেতে হবে—তা সে যেখানেই হোক!"

লীলা তাহার উদ্গত অশ্রুজল বস্ত্রাঞ্চলে মুছিতে মুছিতে মায়ের নিকট সরিয়া আসিয়া বলিল, "না মা—আমি তোমাদের ছেড়ে আর কোথাও যেতে পারবো না!"

গৃহিণী কন্যাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়া প্রায় সরোদনে বলিতে লাগিলেন—"কি করবে মা, না পারলেও তোমাকে যেতেই হবে; হিঁদুর মেয়ের যে পতি ভিন্ন আর গতি নেই! আর শুন্‌লে তো মা,—উনি বললেন তোমাকে রাখবার আমাদের কোন অধিকারই নেই! কর্ত্তব্য যতই কঠোর হোক্ না কেন, আমরা তা পালন করতে বাধ্য!"

লীলাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া কমলা তাহার চোখ দু'টি মুছাইয়া দিতে দিতে নরেশকে ভৎর্সনার সুরে বলিতে লাগিল, "ছিঃ! তুমি এতবড় শয়তান! তোমার শরীরে কি একটুও দয়ামায়া নেই? তোমার মনে কি একতিল বিবেচনা নেই? আমাদের সকলকে ব্যথা দিয়ে, আমাদের সমস্ত অনুরোধ উপরোধ উপেক্ষা করে তুমি একে কেড়ে নিয়ে যেতে চাও? কিন্তু—আমি বেঁচে থাকতে তা হতে দিচ্ছি না জেনো! লীলা এখনও ছেলে-মানুষ—নেহাৎ কচি বাচ্ছা! এই দুধের মেয়েকে আমি একলা পাঠাবো তোমার মতো একজন একগুঁয়ে লোকের ঘর করতে?

সে তুমি মনের কোণেও ঠাঁই দিও না। আমিও যাবো ওর সঙ্গে—যেখানেই তুমি নিয়ে যাও না কেন ওকে! আমি কিছুতেই একে একলা তোমার মতো এক গোঁয়ারের হাতে ভরসা ক'রে ছেড়ে দিতে পারি না। যার মনে এক ফোঁটা দয়ামায়া নেই, সে সব করতে পারে! কোন্ দিন রাগের মাথায় হয় ত' একে মেরেই বস্‌বে! আমি থাক্‌বো এর কাছে অষ্ট-প্রহর পাহারা দিয়ে, দেখি তুমি এর কি করতে পারো?"

কমলার এতবড় ভৎর্সনাটা উচ্চ হাস্যে উড়াইয়া দিয়া, তাহার সমস্ত ভীতি-প্রদর্শনকে এক মুহূর্ত্তে ব্যর্থ করিয়া, নরেশ খুব আগ্রহের সহিত বলিয়া উঠিল, "বাঃ, এ তো বেশ ভাল কথা বৌদি! এই সবে প্রথম নতুন সংসার পাততে যাচ্ছি—আমরা দু'জনেই এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ; কিছুই জানি না। তুমি যদি দয়া ক'রে গিয়ে আমাদের গোড়ার দিকটার সব গোছ-গাছগুলো ক'রে দাও; সে তো তা হ'লে খুব ভালই হয়!"

দ্বিতীয় অংশ

১

কমলা মুখে যাহা বলিয়াছিল, কাজেও তাহাই করিয়াছে। নরেশ যেদিন সত্য সত্যই লীলাকে তাহার পিত্রালয় হইতে লইয়া আসিল, কমলাও তাহাদের সঙ্গে আসিয়াছিল। তারপর আজ প্রায় এক বৎসর হইতে চলিল—কমলা কিন্তু এখনও লীলার নিকট হইতে চলিয়া আসিতে পারে নাই। ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করিয়া পত্নীকে তাহার পরমাত্মীয় দু'টীর স্নেহপাশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আনায়, পতি-পত্নীর মধ্যে যে কঠিন ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছিল, অসাধারণ সংযম ও অধ্যবসায়ের সহিত নরেশ তাহা দূর করিবার একান্ত চেষ্টা করিতেছিল বটে, কিন্তু দুরদৃষ্ট বশতঃ সেদিনও পর্য্যন্ত তাহাদের মধ্যে সন্ধি বা শান্তির কোনও পুণ্য প্রতিষ্ঠান ঘটিয়া উঠে নাই; তাই কমলাও আর নিশ্চিন্ত হইয়া গৃহে ফিরিতে পারে নাই।

শ্বশুরালয় পরিত্যাগ করিয়া আসিবার অল্প দিন পরেই সৌভাগ্যক্রমে নরেশ গভর্মেণ্টের 'মিউনিশন' বিভাগে যুদ্ধসংক্রান্ত মাল সরবরাহের কাজ পাইয়াছিল। তাই আশাতিরিক্ত অর্থ

উপার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গেই লীলার মনোরঞ্জনের জন্য সে একখানি প্রাসাদ-তুল্য নূতন বাড়ী কিনিয়াছে। প্রিয়তমার পিতৃগৃহের যে ঘরে যেখানে যে আস্‌বাবটি যেমন করিয়া সাজানো ছিল, নরেশ কলিকাতার সমস্ত দোকানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া হুবহু সেই রকমেরই সব জিনিসপত্র আনিয়া এ বাড়ীখানিকেও ঠিক তেমনিই করিয়া সাজাইয়াছে; কিন্তু তথাপি লীলার নিকট হইতে এখনও নরেশ তাহার অপরাধের জন্য ক্ষমা লাভ করিতে পারে নাই।

সেদিন সকালে নূতন বাড়ীর ড্রয়িংরূমে একখানি আরাম চেয়ারে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় বসিয়া লীলা কার্পেটের উপর পশমের নক্সা বুনিতেছিল; আর কমলা পাশের একখানি কৌচে বসিয়া লীলাকে নবপ্রকাশিত একখানি উপন্যাস পড়িয়া শুনাইতেছিল। গল্পটী শুনিতে শুনিতে হঠাৎ লীলার হাতের বোনার কাঠি কার্পেটের অসমাপ্ত ঘরে স্থির হইয়া গেল। কমলা তখন পড়িতেছিল—

"স্ত্রী এবার জোর করিয়া বলিল, 'না!'

গোড়ায় বটে স্বামীর অপরাধ হইয়াছিল; কিন্তু এবার সম্পূর্ণ দোষ স্ত্রীর। প্রাণপণ যত্নে সে পত্নীকে সুখী করিবার চেষ্টা করিয়াছে, যাহাতে স্ত্রী তাহার অপরাধ ভুলিয়া গিয়া হাসিমুখে তাহাকে ক্ষমা করিতে পারে। যাহাতে অন্ততঃ করুণাপরবশ হইয়াও স্ত্রী তাহাকে আবার পূর্ব্বের ন্যায় প্রীতির চক্ষে দেখিতে

পারে, এই আশায় দিবারাত্রি বেচারী কত না কষ্ট, কত না মনোবেদনা সহ্য করিতেছে। যত বড় একগুঁয়ে মেয়েই হোক না কেন পিতামাতার প্রতি যত বেশি টানই তার থাক্ না কেন, স্বামীর সে প্রাণপাত যত্ন, সে অগাধ অকৃত্রিম ভালবাসা যে এমন অযাচিত ভাবে পায়, সে কখনই তার অনুতপ্ত পতিকে মার্জ্জনা না করিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু অদ্ভুত এই মেয়েটীর চরিত্র! যে, সে কিছুতেই তার এমন স্বামীরও অনুরাগিণী হইতে পারিল না। স্বামী তার যেমন প্রতি দিন নিজের স্বার্থ ও সুবিধার সহস্র হানি স্বীকার করিয়াও বিমুখ পত্নীর প্রেমনিষ্ঠ হইয়া তাহাকে সদয় দেখিবার জন্য উন্মুখ হইয়া অপেক্ষা করিতেছে, স্ত্রী কিন্তু তেমনিই নীচ স্বার্থপরের ন্যায় তার সুখ সুবিধার ঈষৎ ব্যতিক্রমটুকু কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছে না। স্বামী যেমন তাহার অপরাধের তুলনায় শতগুণ বেশি প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে—স্ত্রী কিন্তু তেমনি নির্ব্বোধের ন্যায় তার নিজের অপরাধের বোঝা প্রতি দিন ভারি করিয়া তুলিতেছে; কাঁচা ঘুমটি ভাঙিয়া দিয়া শিশুকে জাগাইয়া তুলিলে, তার অভিমানের একঘেয়ে কান্না যেমন কিছুতেই থামিতে চাহে না, এ অভাগিনীর অভিমানের অন্ধকারও যেন তেমনি কিছুতেই দূর হইতেছিল না। সহস্র চেষ্টা করিয়াও স্বামী তাহাকে প্রবোধ দিতে পারিতেছে না।”

কমলার পড়ায় বাধা দিয়া লীলা চকিত বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা

করিল, "বৌদি! সত্যিই কি ও বইখানায় ওসব কথা লেখা রয়েছে?"

"সত্যি নয় ত কি আমি এসব বানিয়ে বলছি?"

"যা পড়লে তাই কি সব ঠিক অক্ষরে অক্ষরে লেখা?"

"অত কথায় কাজ কি বাপু, তুমি কেন নিজেই একবার স্বচক্ষে প'ড়ে দেখ না।" এই বলিয়া কমলা বইখানি লীলার হাতে তুলিয়া দিল। লীলা অনেকক্ষণ বইখানি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিল, তার পর ধীরে ধীরে বন্ধ করিয়া কমলাকে ফিরাইয়া দিল। কমলা এতক্ষণ উদ্‌গ্রীব হইয়া লীলার মুখভাব লক্ষ্য করিতেছিল। বইখানি ফেরত পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন, এখন বিশ্বাস হ'লো তো?"

লীলা একটু চিন্তিত ভাবে বলিল, "দেখ, এ উপন্যাসখানার ঘটনাটা আমার জীবনের ব্যাপারের সঙ্গে যেন অনেকটা মিলে যাচ্ছে! কিন্তু কে লিখেছে—তার নাম নেই তো? গ্রন্থকারের নাম কি জানো?"

"কি ক'রে জান্‌বো বল? তুমি যা বল্‌লে, বইখানা পড়তে পড়তে আমারও ঠিক তাই মনে হয়েছিল বটে! তা আমি ভাবলুম, বোধ হয় হঠাৎ কোন দৈবচক্রে এ উপন্যাসের ঘটনা সব তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর অবস্থার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে!"

লীলা অসহিষ্ণুর মত তীব্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "না বৌদি!

তুমি জানোনা, এ নিশ্চয় কেউ জানাশুনো লোক, আমাকে উপহাস করবার জন্যে ইচ্ছে করেই এসব লিখেছে। কিন্তু কে সে বল' ত ?”

“তোমাদের ভেতরকার ঘরোয়া কথা সব জানে অথচ বইটই লিখ্‌তে পারে—এমনতর আত্মীয় যে কেউ আছে, তা তো আমি জানি না !”

“দেখ, আমার বোধ হয় এ কোনও পুরুষ মানুষের লেখা, বন্ধুত্বের খাতিরে যার কাণে এসব কথা কতকটা পৌছেচে !”

মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে কমলা জিজ্ঞাসা করিল, “কথাটা কোন্ দিক থেকে আর একজনের কাণে পৌছেচে শুনি ? তবে কি নরেশই মনের দুঃখে—”

বাধা দিয়া লীলা বলিল—“সে যেদিক থেকেই হোক্ না,—যে লোকটা কিন্তু লিখেছে সে একটা একের নম্বর গাধা ! পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের স্বাভাবিক টান, আর মেয়েছেলের প্রতি তাঁদের অগাধ স্নেহটাকে এ মূর্খের মত কদর্য্য বিদ্রূপ করেছে ! তার মাধুর্য্য ও মহত্বটুকু একবারও এই হৃদয়হীন লেখকটির চোখে পড়েনি, কিংবা হয় ত' ইচ্ছে ক'রেই সেদিকটায় চোখ বুজিয়ে লিখে গেছে !”

কমলা এবার উচ্চহাস্য করিয়া বলিল, “তুমি যে দেখছি বই-খানার অপ্রকাশিত লেখকটির উপর একেবারে হাড়ে চটে গেলে !”

"যাবো না !—এক যায়গায় দেখলুম, নির্লজ্জের মত লিখেছে কি না—'সে স্ত্রী অসতী, যে স্বামীর চেয়ে তার পিতামাতাকে বেশি ভালবাসে !' সতীত্ব সম্বন্ধে লেখকটির কি চমৎকার ধারণা দেখেছো ? সাধে কি মূর্খ বলছি,—পিতামাতাকে ভালবাসা ভক্তি করা যে সতীত্বেরই একটা আদর্শ গুণ—এ সাধারণ জ্ঞানটুকু এ লোকটির মাথায় নেই !"

"না লীলা, এ কথায় আমি তোমার সঙ্গে সায় দিতে পারলুম না। কেন না, তুমি যা এতে নেই বল্‌ছো, তা কিন্তু ঠিক্ পরের পাতাটায়ই রয়েছে—সবটা পড়লে বুঝতে পারতে ;—এই শোনো—"

কমলা পড়িতে লাগিল—"মেয়ে যখন অবিবাহিতা বালিকা, তখন পিতামাতার প্রতি তার সমস্ত স্নেহ ভালবাসা অর্পিত থাকাই স্বাভাবিক ; কিন্তু যৌবনে সুযোগ্য স্বামীর সাহচর্য্যে চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, তেমনিই পতিপ্রেম তার সমস্ত স্নেহ-ভালবাসা আকর্ষণ ক'রে রাখে। তার পর যখন সে সন্তানবতী জননী হইয়া উঠে, তখন অবশ্য তার সেই মাতৃহৃদয় সমস্ত জগৎকেই অপরিসীম স্নেহধারায় অভিষিক্ত ক'রে দিতে চায় !"

দুই কাণে হাত দিয়া লীলা বলিয়া উঠিল, "থাক—থাক্, বৌদি ; বন্ধ কর, ও ছাই-ভস্ম আর তোমায় পড়তে হবে না। আমি ও শুন্‌তে চাই না। যতই শুন্‌ছি, ততই বইটার উপর

আমার অশ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছে—আর যে লোকটা লিখেছে তার উপর আমার একটা ঘেন্না ধরে যাচ্ছে! ছিঃ! তুমি কি আর পড়বার মতো বই খুঁজে পেলে না বৌদি?"

কমলা এ প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়া নীরবে নতমুখে বই-খানার পাতা উল্টাইতে লাগিল। লীলাও অনেকক্ষণ চুপ করিয়া কার্পেটখানার অসমাপ্ত ফুলটা শেষ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; কারণ, মন তার বোনার কাঠির অনুসরণ না করিয়া, তখনও সেই 'ছাই-ভস্ম' বইখানার কথাই তোলাপাড়া করিতেছিল। শেষটা আর চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া কমলাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, ও বইখানা শেষ হয়েছে কি ভাবে বৌদি? ওদের পরিণাম কি হ'লো শুনি?" কথাটা লীলা এমন তাচ্ছিল্যের সহিত জানিতে চাহিল, যেন এ বিষয়টা শুনিবার জন্ত তার এমন কিছু বিশেষ আগ্রহ নাই। কিন্তু তাহার এ ছলনা তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী কমলাকে একটুও প্রতারিত করিতে পারিল না। লীলার মনের প্রকৃত অবস্থাটা বুঝিতে পারিয়া কমলা চুপটি করিয়া মনে মনে হাসিতে লাগিল। কোনও উত্তর দিল না, যেন কথাটা সে শুনিতেই পায় নাই।

লীলা আবার জিজ্ঞাসা করিল, "শেষটা ওদের কি হ'ল বৌদি?"

যেন কতই অন্তমনস্ক ছিল, এমনি ভাবে কমলা জিজ্ঞাসা করিল, "কাদের?"

লীলা বিরক্ত হইয়া বলিল, "আহা, ওই যে গো, তোমার হাতের ঐ জঘন্য বইখানায় যে স্বামীর-স্ত্রীর কথা লিখেছে!"

কমলা তেমনিই অন্যমনস্ক ভাবে জবাব দিল, "শেষটা তেমন ভাল নয়,—বড় করুণ আর বিয়োগান্ত ব্যাপার!"

লীলা এবার রাগিয়া উঠিল,—অনেকক্ষণ আর কিছুই জিজ্ঞাসা করিল না। তার পর কিন্তু আবার নরম হইয়া জানিতে চাহিল "কার পরিণামটা বেশি শোচনীয় করেছে দেখলে?"

কমলা এবার লীলার মুখের দিকে চাহিয়া উৎসুক আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আন্দাজ করে বল দেখি কার? দেখবো বলতে!"

কার্পেট, কাঠি, পশমের গোলা সমস্ত পাশের টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া লীলা বলিল, "এসব স্থলে মেয়ে মানুষকেই ভুগ্‌তে হয় বেশি। নিশ্চয় দুঃখ পেয়েছে শেষটা স্ত্রীই সব চাইতে; কেন না, গোড়া থেকেই লেখক দেখিয়েছেন যে, সে কষ্ট পাচ্ছে কেবল নিজের দোষে!"

কমলা বইখানির শেষ পরিচ্ছেদটি খুলিয়া দেখিতে দেখিতে বলিল, "ঠিক বলেছিস্ লীলা,—এ স্ত্রী দেখছি শেষটা আর এক-জনের প্রেমে পড়ে' গেল!"

লীলা যেন চম্‌কাইয়া উঠিল, বিবর্ণ মুখে জিজ্ঞাসা করিল "সে কি! আর একজনের প্রেমে পড়ে' গেল?"

"হ্যাঁরে, এই যে এখানে লিখেছে শোন্ না—"বলিয়া কমলা পড়িতে লাগিল—'সকল নারীর জীবনেই এক দিন আসে, যেদিন প্রেমের সবচিন্ ঠাকুরটি তাঁর সুরভিত পুষ্পধনুর আঘাতে তার হৃদয়ে প্রণয়ের অগ্নিশিখা প্রজ্জলিত করিয়া দেন। সে দিন সে যদি স্বামীকে না পায়, স্বামীকে ভালবাসিতে না পারে, তাহ'লে অনিবার্য্য ভাবে অন্য কোনও পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়, যার কাছে সে একটুও সহানুভূতি লাভ করিতে পারে। অনাদিকাল হইতে জগতে প্রকৃতির এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে।'

লীলা এবার ভীত হইয়া উঠিল। সভয় কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "অন্য কোনও পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়? সে কি বৌদি! হ্যাঁগা সত্যি?"

"তাই তো জানি। আর চোখেও দেখেছি অনেকগুলো এ রকম ঘটনা।"

লীলা দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল, "বল কি বৌদি? স্বামীকে ছেড়ে অন্য একজনকে?—কি ভয়ানক!" বলিতে বলিতে লীলা টেবিলের উপর হইতে বুনিবার সরঞ্জামগুলা তুলিয়া লইয়া আবার বুনিতে সুরু করিল; কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই বোনার কাজ বন্ধ করিয়া আপন মনে কি যেন ভাবিতে লাগিল। কমলাও আর কোনও উচ্চবাচ্য না করিয়া নীরবে বই পড়িতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া লীলা জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ, তার স্বামীর কি হ'ল বৌদি ?

"তারও একটা কিনারা হয়েছে দেখলুম। সে বেচারি ভয়ানক অসুখে পড়েছিল। স্ত্রী তো ঐ রকম, দেখবার শোনবার আর কেউ ছিল না। শেষ পাড়ার একজন অনেক সেবা-শুশ্রূষা ক'রে তাকে বাঁচালে। সে একটি গরীবের মেয়ে,—সুন্দরী, বয়সও হয়েছে ; কিন্তু পয়সার অভাবে বিবাহ হয়নি তখনও—"

"সে কি করে জুটলো ?"

"তারা যে ওদের বাড়ীর পাশেই থাক্‌তো ! বিধবা মা আর ঐ সোমত্ত মেয়ে, দুটীতে কায়ক্লেশে সংসার চালাতো। বড় গরীব, কোনও দিন খেতে পেতো, কোনও দিন পেতো না। ইনি তাদের দুঃখের কথা জানতে পেরে, সহানুভূতি জানিয়ে, প্রায়ই কিছু কিছু সাহায্য করতেন। তাই উপকারীর প্রত্যুপকার করবার জন্য, ওঁর প্রতি তাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাবার সুযোগ পেয়ে, তারা মায়ে-ঝীয়ে অনাহারে অনিদ্রায় প্রাণপাত করে রোগশয্যায় তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করতে লাগল। বিমুখ পত্নীর নিরবচ্ছিন্ন অবহেলায় স্বামীর মনটা এত দিন যেন শূন্য কুটীরের মতো হা-হা করছিল। পীড়িত অন্তরটি কাতর হ'য়ে এত দিন একটি প্রাণের মত মনের-মানুষের সন্ধানে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে ফিরছিল ; ঠিক সেই সময়ে এই মেয়েটি এসে, ধীরে ধীরে তার

অক্লান্ত সেবা যত্ন দিয়ে, তার সকৃতজ্ঞ হৃদয়ের অপরিসীম শ্রদ্ধা প্রতিনিয়ত নিবেদন ক'রে, আর সুন্দর সর্ব্বাঙ্গে তার মুকুলিত যৌবনের সদ্য-সঞ্চারিত তরুণ লাবণ্যশ্রীর দুর্নিবার আকর্ষণ নিয়ে সেই শূন্য মন্দিরটি সম্পূর্ণ দখল করে ফেললে! তার পর এমন এক দিন এল, যেদিন সেই দু'টি অপূর্ণ জীবন একত্র মিলিত হ'য়ে পরস্পরের নিবিড় প্রেমে বিলীন হ'য়ে সার্থকতা ও সম্পূর্ণতার চিরবাঞ্ছিত সুখস্বপ্নে বিভোর হয়ে রইল।"

লীলা শুনিয়া ধিক্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, "ছিঃ ছিঃ—সে মেয়েটা কি গো! তার একটা বিবাহিতা স্ত্রী রয়েছে জেনেও তাকে—"

মৃদু হাসিতে হাসিতে কমলা বলিল, "তাতে কিছু এসে যায় না বোন্! যে ভালবাসে সে তার প্রেমাস্পদের কাছে কণামাত্র প্রতিদান পেলেই জীবন ধন্য মনে করে। এ মেয়েটীও তার আকাঙ্ক্ষিত প্রণয়ীর কাছে তার প্রাণঢালা ভালবাসার আশাতিরিক্ত বিনিময় পেয়ে, তার ঐ বিবাহিতা পত্নী বর্ত্তমান আছে জেনেও আপনাকে বিলিয়ে দিতে একটুও ইতস্ততঃ করেনি। কারণ, এ বুঝতে পেরেছিল যে, সে পত্নী স্ত্রীর কর্ত্তব্যে অবহেলা করে স্বামীর উপর তার সব অধিকার হারিয়ে ফেলেছে! সে সতীন বটে, কিন্তু স্বামীর হৃদয়ের ভাগ নিতে অক্ষম!"

লীলা আর কিছু বলিতে পারিল না; অনেকক্ষণ চুপ করিয়া

বসিয়া রহিল। কি যেন আভার চিন্তার অকূল পাথারে সে তখন তলাইয়া যাইতেছিল। তার পর হঠাৎ কি ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা বৌদি, ঠিক্ ক'রে বলো, তুমি হ'লে কি এ রকম অবস্থায় ঐ দুঃখী মেয়েটার মতো করতে?"

কমলা সজোরে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল,—"কখনই না।" তার পর হাসিতে হাসিতে বলিল—"আমি চাই সবটা নিতে, পূরোপূরি একচেটে ক'রে—নইলে কিছুই নেবো না! খুচ্‌রো ব্যাপারী তোর বৌদি নয়, বুঝলি।"

কমলার জবাব শুনিয়া লীলা আর কোনও কথা কহিল না, মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে আবার বোনার কাজ সুরু করিয়া দিল। কিন্তু গোটাকয়েক ফুল তোলা শেষ হইতে না হইতেই আবার জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ ভাল কথা, শেষ পর্য্যন্ত তার কি দুর্দ্দশা হ'লো বৌদি।"

"কার?"

"সেই বিবাহিতা স্ত্রীটীর?—সে তো আর একজনের প্রেমে পড়েছিল বল্‌লে—তার পর?—তার দুর্গতিটা কতদূর গড়ালো শুনি?"

কমলা হাসিতে হাসিতে বলিল, "দুর্গতিই বটে! তার সেই একতরফা প্রেমের স্বপ্নটা যে দিন সেই হৃদয়হীন নবাগতের পঙ্কিল বাসনার কদর্য্যতায় ঠেকে চুরমার হ'য়ে গেল, সে দিন সে তার নিজের ভুল বুঝ্‌তে পেরে, স্বামীর কাছে ধরা দিতে গেল। কিন্তু

এসে দেখলে—যে দ্বার এক দিন তারই পথ চেয়ে উন্মুক্ত পড়ে ছিল, সে পথে আজ এক আগন্তুক প্রবেশ করে তার সমস্ত অধিকার দখল ক'রে বসেছে! যে মুহূর্ত্তে সে জান্‌তে পারলে যে, স্বামী তার আর একজনকে ভালবেসেছে, অমনি তার সমস্ত অন্তর যেন ক্ষুধিত হ'য়ে সেই হারিয়ে-ফেলা স্বামীর জন্য লালায়িত হয়ে উঠ্‌ল! সে তখন প্রাণপণে নিজের স্বামীকে ফিরে পাবার জন্যে বিধিমতে চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌ল; কিন্তু তখন আর চেষ্টা করা বৃথা, অনেক বিলম্ব হ'য়ে গিয়েছিল তার—"

এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই লীলা হঠাৎ চেয়ার হইতে উঠিয়া পড়িল। বোনার সাজ-সরঞ্জামগুলা সেই চেয়ারের উপরই রাখিয়া দিয়া, তাড়াতাড়ি ঘরের একধারের একটা আলমারীর কাছে গেল, এবং ব্যস্ত ভাবে চাবি খুলিয়া আলমারীর দেরাজগুলা টানিয়া টানিয়া কি যেন খুঁজিতে লাগিল।

কমলা জিজ্ঞাসা করিল, "কি খুঁজ্‌ছিস্‌রে!"

"সে 'ফটো'খানা কোথায় আছে, জানো বৌদি?"

"কোন্‌খানা?—সেই বরক'নের বেশে তোর আর নরেশের 'যুগলমূর্ত্তি' যেখানেতে তোলা হ'য়েছিল?"

"যাও! তুমি ভারি দুষ্টু!"

"তবে কোন্‌খানা?—বে'র আগে নরেশ তার যে ছবিখানা তোকে উপহার দিয়েছিল?"

"না, দূর! কিন্তু কি হ'লো বল তো সেখানা?"

কমলা মৃদু হাসিয়া বলিল "বারে মেয়ে! মনে নেই বুঝি, সেখান থেকে চলে আসবার পর সেই এক দিন তুই বল্‌লি যে, তার ছবি পর্য্যন্তও কাছে রাখ্‌বিনি,—আমি তাই তোর কাছ থেকে সেখানা চেয়ে নিয়ে লুকিয়ে রেখেছি যে!"

"তুমিই লুকিয়ে রেখেছো বুঝি?"

"কি আর করি! ছবিখানা নষ্ট হবে, তাই তুলে রাখ্‌লুম। যে তোমার তখন ল্যাজ-ফোলা রাগ!—জানি, রাগ পড়লে এক দিন না এক দিন তার খোঁজ হবে—" বলিতে বলিতে কমলা উঠিয়া গিয়া তার টেবিলের টানার ভিতর হইতে নরেশের একখানা বড় ফটোগ্রাফ বাহির করিয়া লীলার হাতে দিল।

"তাই তো, এখানা সেই অব্‌ধি তোমার কাছেই রয়েছে বুঝি? আর আমি চারিদিকে খুঁজে মরছি—" বলিতে বলিতে লীলা ছবিখানা না দেখিয়াই, একেবারে আলমারীর ভিতর পুরিয়া চাবি বন্ধ করিয়া দিয়া, চেয়ারে ফিরিয়া আসিয়া বসিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ অস্থির ভাবে আবার উঠিয়া গিয়া, চাবি খুলিয়া আলমারীর দেরাজ হইতে ছবিখানা বাহির করিয়া আনিয়া দেখিতে দেখিতে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ বৌদি, ইনি কি ওই নতুন বইখানা পড়েছেন?"

"কি জানি?—দেবো না কি তাকে এখানা পড়্‌তে?"

লীলা প্রথমটা উদাস ভাবে বলিল, "তোমার ইচ্ছে!" কিন্তু তার পরই মুখ ভার করিয়া অভিমানিনীর মত অনুযোগের কণ্ঠে বলিতে লাগিল, "তোমার ভারি ইচ্ছে যাচ্ছে, তাঁর কাছেও ব'সে এই যাচ্ছে-তাই বইখানা এই রকম চেঁচিয়ে পড়ে তাঁকেও শোনাতে—না? তোমার মনের ভাবটা কি আর আমি বুঝতে পারিনি মনে করেছো?—যাতে আমি অপদস্থ হই, তোমার কেবল সেই চেষ্টা!"

কমলা ইহার কোন উত্তর দিবার আগেই একজন ঝী আসিয়া লীলার হাতে একখানা ডাকের চিঠি দিয়া গেল। লীলা চিঠির খামের উপর ঠিকানাটার লেখা দেখিয়াই বলিল, "বাবা চিঠি লিখেছেন বৌদি!"

তাড়াতাড়ি লীলা খামখানা ছিঁড়িয়া যখন চিঠিখানা বাহির করিতেছে, এমন সময় নরেশ আসিয়া ঘরে ঢুকিল। নরেশকে দেখিয়াই লীলা চিঠিখানি আঁচলের মধ্যে লুকাইয়া লইয়া, তৎক্ষণাৎ সে ঘর হইতে অন্য ঘরে চলিয়া গেল। নরেশ একবার সেদিকে চাহিয়া বলিল, "দেখ্‌লে বৌদি! আমি যখনই এসে ঘরে ঢুকি, অমনি ও আমার সাম্‌নে থেকে সরে যায়।—আজ এক বচ্ছর ধরে আমার সঙ্গে ও এম্‌নি লুকোচুরি খেল্‌ছে!"

কমলা সে কথার আর কোনও জবাব না দিয়া জিজ্ঞাসা

করিল, "তোমাকে আজ এমন শুক্‌নো শুক্‌নো দেখ্‌ছি কেন? শরীরটা কি ভালো নেই?"

নরেশ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "শরীর বেশ আছে বৌদি, কিন্তু মনটা আজ ভারি দ'মে গেছে! 'গরীবের মেয়ে' বলে একখানা নতুন উপন্যাস বেরিয়েছে, তুমি পড়েছো কি?"

"গরীবের মেয়ে? হ্যাঁ—হ্যাঁ,—আমি তো সেইখানাই এখন লীলাকে প'ড়ে শোনাচ্ছিলুম!"

"লীলাও জানে?—কি বল্‌লে সে বৌদি, গল্পটা শুনে?"

"সে বলে ওখানা যাচ্ছেতাই,—বটতলার বাজে বই।"

নরেশ গম্ভীর হইয়া বলিল, "না বৌদি, নেহাৎ বাজে নয়; আমি তো পড়তে পড়তে প্রথমটা চম্‌কে উঠেছিলুম! মনে হচ্ছিল, যেন আমারই বিবাহিত জীবনের চিত্রখানা হুবহু চোখের সাম্‌নে দেখ্‌তে পাচ্ছি! এই বইখানার ভেতর থেকে আমি এমন একটা কিছু পেয়েছি, যা সত্যিই আমাকে রীতিমত ভাবিয়ে তুলেছে ভাই!"

কমলা হাসিয়া ফেলিয়া বলিল—"ও কিছু নয়,—কোনও প্যাঁচওয়া বই পড়লেই খানিকক্ষণ মনের ওপোর তার একটা প্রভাব থাকে।"

"কিন্তু বইখানি পড়ে অবধি আমার ভারি ভয় হচ্ছে,—বুঝি আমার জীবনেও শেষটা ঠিক্ ঐ রকমই ঘট্‌বে!"

"কেন, পাশের বাড়ীতে কি কোনও গরীবের সোমত্ত মেয়ে আইবুড়ো থুবড়ী হ'য়ে আছে—সন্ধান পেয়েছো ?"

"ঐ তো ! তোমার সবেতেই ঠাট্টা ! আমি নিজের বিষয় তত ভাবি না,—লীলার জন্যেই ভয় পাচ্ছি !"

"কিন্তু আমার ভয়টা যে তোমার জন্যেই বেশি হচ্ছে !—কেন জানো ?—লীলার দাদা যখন ডাক্তারী শিখ্ছিল, তখন সে প্রায়ই বল্তো যে, "দেখ, এই সব রোগের লক্ষণ ক্রমাগত পড়তে প'ড়তে আমার মনে হ'চ্ছে, যেন আমারও শরীরে যত কিছু রোগের লক্ষণ দেখ্তে পাচ্ছি !'—তাই ভাব্ছি যে, 'গরীবের মেয়ে' পড়ে শেষটা তুমিও না কোনও গরীবকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার ক'রে বসো !" কথাটা শেষ করিয়া কমলা খুব খানিকটা হাসিয়া উঠিল !

নরেশ কিন্তু অতিরিক্ত গাম্ভীর্য্যের সহিত সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিতে লাগিল, "হাসির কথা নয় কমলা !—ওটা ভারি সত্য।—তবে তোমায় আজ স্পষ্টই বলি শোন,—আমারও বুকের ভিতর মাঝে মাঝে একটা দুর্দ্দান্ত লোভ এসে উঁকি মারে। আমি তার প্রবল শক্তির কাছে হয় তো কোন্ দিন পরাভূত হ'য়ে যাবো ! তুমি জানো না, সে কত বড় লোভ !—আমার জীবনের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষার সফলতা দেখিয়ে, সে আমাকে প্রতি দিন এমন প্রলুব্ধ করছে

যে, ক্রমেই তাকে দাবিয়ে রাখা আমার পক্ষে শক্ত হ'য়ে পড়ছে!"

কমলা ভ্রূকুটী করিয়া বলিল, "তোমার সব তাতেই বাড়াবাড়ি নরেশদা—বইখানা তো আগাগোড়া পড়লুম। তাতে এমন কিছু নেই যাতে স্বামীর দল তোমার মতো এতটা ভড়্‌কে যেতে পারে। আমার তো মনে হয় যে, বইখানার সার মর্ম্ম হচ্ছে—একগুঁয়ে মেয়েমানুষদের একটু সুমতি দেওয়া! বিশেষতঃ—যাদের কাঁচা বয়েস আর অল্পদিন বিয়ে হয়েছে, তাদের স্বামী তো প্রায়ই কালকের ছেলে,—হয় ত' সবে টাট্‌কা কলেজ ছেড়েছে, নয় ত তখনও পর্য্যন্ত পাঠশালার সম্পর্ক চোকেনি। বের আগের দিন পর্য্যন্ত কেবল ছেলে-ছোকরার দলেই তার মেলা-মেশা ছিল। তার কাছে একেবারে অপরিচিতা যুবতীর সঙ্গে মেলা-মেশার আদব-কায়দা সম্বন্ধে নিখুঁত অভিজ্ঞতাটুকু আশা করা যায় না। বিয়ের পরদিনই সে কিছু একেবারে পাকা স্বামীটি হ'য়ে উঠতে পারে না। সেটা হ'তে তার কিছু দিন সময় লাগে। তার পুরোনো অভ্যাসগুলো ফস্ করে ছেড়ে দিয়ে, সে কিছু এক দিনেই বিবাহিত জীবনের সমস্ত দায়িত্বটুকু বুঝে নিয়ে, রাতারাতিই একজন কর্ত্তব্যপরায়ণ পতি হ'য়ে উঠ্‌তে পারে না। প্রথম প্রেমের একটা প্রবল মাদকতা, জীবনে নূতন নারীসাহচর্য্যের একটা অভিনব আনন্দ,—তাকে প্রচুর শক্তি ও উৎসাহ এনে

দেয় বটে, কিন্তু সেটা পূরোপূরি গ্রহণ করতে তার যথেষ্ট সময় লাগে।”

প্রবল উৎসাহের সহিত কমলার ডান হাতখানি ধরিয়া ঘন ঘন নাড়িয়া দিয়া নরেশ বলিল, “ঠিক্ বলেছো তুমি! সেদিনও পর্য্যন্ত বুঝ্‌তে পারিনি যে, কোন্‌খানে আমার ত্রুটী! যেদিন পারলুম, সেদিন সে আমার কাছ থেকে আরও দূরে সরে গেল! কিন্তু তুমি তো নিজের চক্ষে দেখেছো কমলা—আজ পর্য্যন্ত তাকে ফিরে পাবার জন্যে আমি কি না করিছি! প্রতি দিন সব দিক দিয়ে চেষ্টা করিছি, কিসে তার প্রাণের কাছটিতে গিয়ে পৌছতে পারি। কিন্তু কিছুতেই তাকে আপনার ক’রে নিতে পারলুম না; সে আমার নিকটতম হওয়া দূরে থাক্, আরও তফাতে স’রে গেল! এ সব তো তুমি চক্ষের সামনে দেখ্‌তে পাচ্ছ!—সে কি আমার দোষ?—আমার চিন্তা, আমার আকাঙ্ক্ষা ব্যাকুল হয়ে দিনরাত তার পিছনে ফিরছে; কিন্তু সে দেখো, পাথরের মতো নিরুত্তর হ’য়ে আছে। তার মনস্তুষ্টির জন্যে নিত্য নূতন উপায় খুঁজে খুঁজে আমি ক্লান্ত হ’য়ে পড়িছি; কিন্তু তবুও তো তার আশা আজও ছাড়তে পারিনি! তার প্রতি আমার যে অগাধ ভালবাসা, তা যেন আরও গভীর, আরও গাঢ়তর হ’য়ে উঠেছে—অথচ তার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু প্রতি দিনের পুঞ্জীভূত নৈরাশ্যের দল যেন ভিড় করে এসে হৈ হৈ শব্দে আমার মনের মধ্যে ঢুকে

পড়েছে! মাঝে মাঝে তারা এমন প্রবল হ'য়ে ওঠে যে, আমার সমস্ত আশা-ভরসাকে একেবারে আঁধার করে দেয়! আমি তখন নিতান্ত অসহায়ের মতো একজন ব্যথার ব্যথী, আপন জন খুঁজে বেড়াই; কিন্তু কাউকেই দেখ্‌তে পাই না—কেবল তুমি—তখন তুমিই কেবল তোমার সেবাপরায়ণ শান্ত স্নিগ্ধ রূপটি নিয়ে, তোমার অসীম সমবেদনার অক্ষয় সৌন্দর্য্য নিয়ে, আমার মনের মধ্যে বারবার বরাভয় মূর্ত্তিতে জেগে ওঠো—" বলিতে বলিতে দুই হাত বাড়াইয়া কাঙালের মত ক্ষুধিত দৈন্য দৃষ্টি লইয়া নরেশ কমলার কাছে সরিয়া আসিতেছিল; কিন্তু বিদ্যুতের মত ক্ষিপ্র বেগে কমলা তাহার নিকট হইতে সরিয়া গিয়া বলিল, "হ্যাঁ— তুমি আজকাল বড় মনকষ্টে আছ' দেখ্‌তে পাচ্ছি বটে!"

নরেশ উত্তেজিত ভাবে বলিয়া উঠিল, "আজকাল?—উঃ! তুমি জানো না, কী যন্ত্রণাই আমি সইছি এই গোটা বছরের প্রত্যেক দিনগুলোয়! যেন মনে হচ্ছে—কত অনন্তকাল ধরে আমি এই দারুণ কষ্ট ভোগ করছি! আর দিনকতক যদি এই ভাবে কাটাতে হয়, তাহ'লে আমি বোধ হয় পাগল হয়ে যাবো! ওকে প্রসন্ন করবার জন্যে—ওকে সুখী করবার জন্যে—ওর মুখের প্রীতি-প্রফুল্ল হাসিটুকু দেখ্‌বার জন্যে আমি এত দিন ধ'রে যে প্রাণপাত চেষ্টা ক'রে এসেছি, ক্রমে সেটা আমার কাছে একটা দুর্ব্বহ বোঝার মত ঠেক্‌ছে,—আমি যেন আর সে গুরু ভার সহ্য

করতে পারছি না ! দিন দিন আমার উৎসাহ ক'মে আসছে ! সে চেষ্টা—সে উদ্যম—যেন ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে সুরু করেছে। এখন আমার কেবলই মনে হয়—মিছে—মিছে !—সব মিছে ! ব্যর্থ এ বিপুল চেষ্টা—পণ্ড এ প্রাণপাত পরিশ্রম ! কোনও ফল হ'ল না—উদ্দেশ্য সাধন হ'ল না। পরিণাম যতদূর দেখ্‌তে পেলেম—অন্ধকারের মত মলিন,—শূন্যের চেয়েও ফাঁকা ! আশার একটু ক্ষীণ রেখাও কোনও দিন আমাকে সঞ্জীবিত ক'রে তুললে না ! দু'টো বাহবা, কি কিছু বখশিষ্‌ যা বাড়ীর চাকর-বাকরেও মাঝে মাঝে পায়—আমি যদি অন্ততঃ সেটুকুও পেতুম ! একটু তৃপ্তির হাসি, দুটো সোহাগের বাণী—এও কোনও দিন আমার ভাগ্যে জোটেনি ! এই যে না খেয়ে না দিয়ে এক হপ্তা, পনেরো দিন ক'রে সহরের বাইরে নানান অসুবিধে, হাজার কষ্ট সহ্য করেও ঘুরে আস্‌ছি—এ কি কেবল আমার ব্যবসার উন্নতির জন্যে ? কারবারের সুনাম বজায় রাখার জন্যে ? না—তারই মুখ চেয়ে ? এই যে প্রতি মাসের শেষে রাতের পর রাত বিনিদ্র ব'সে দেনা-পাওনার হিসেব-নিকেশ কষে মরি—এ কি কেবল ওই মাল-সরবরাহ কাজের খাতিরেই ? এর সঙ্গে কি আমার আর কোনও বড় স্বার্থ জড়িত নেই ? সে কি ভাবে—কেন আমি এত পরিশ্রম করি? সে কি বোঝে যে, তার জন্যেই আমার এই কারবার নেওয়া ? সে কি জানে—তার মুখ চেয়েই আমার এ

উপার্জ্জন? মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে পয়সা রোজগার ক'রে আনছি, তাই আবার জলের মতো অকাতরে ব্যয় করছি কার জন্যে বলো ত? এই যে বাড়ী—এই যে সব আস্বাবপত্র—আগাগোড়া সব অগাধ অর্থব্যয়ে ঠিক তার পিতৃগৃহের অনুকরণে সাজিয়ে তুলেছি—এ কি আমার সখের জন্যে? না—তারই মুখ চেয়ে? তার শৈশব কৈশোর যৌবনের সঙ্গে আজন্ম-বিজড়িত যে সব পরিবেষ্টন—তাকে সাধ্যমত অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে এই যে আমি প্রাণপণ যত্ন করছি, এর যে কতখানি মুল্য—কতটা মর্য্যাদা এ যদি সে একটুও বুঝ্‌তো, তাহ'লে যত বড় দুর্জ্জয় অভিমানই হোক্ না তার, সে এমন করে আমার প্রতি বিমুখ হ'য়ে থাক্‌তে পারতো না। সে নির্ব্বোধ, তাই আমার দিকে ফিরেও চাইলে না। কিন্তু মানুষের ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে তো? আমারও সমস্ত দেহ-মন আজ সেই সীমায় এসে পৌঁছেচে। তাই তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠ্‌তে চায়! সমস্ত দিনের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর আমি যখন ক্লান্ত অবসন্ন হ'য়ে ঘরে ফিরি, কেউ তো ছুটে এসে হাসিমুখে আমাকে অভ্যর্থনা করে না,—কারুরই সমবেদনায় উচ্ছ্বসিত সস্নেহ কৃতজ্ঞ দৃষ্টি আমার তনু-মন অভিষিক্ত ক'রে আমাকে আনন্দে আপ্লুত ক'রে দেয় না,—কারুরই সেবারত ব্যগ্র বাহু প্রেমবিচ্ছুরিত স্নিগ্ধ ছায়া বিস্তার ক'রে আমার সমস্ত অবসাদ দূর ক'রে দেয় না—আমার তৃষিত তপ্ত পরিশ্রান্ত চিত্তে শান্তি ও

আরামের চিরবাঞ্ছিত সুষমাটুকু সাগ্রহে ঢেলে দিয়ে আমাকে তৃপ্ত ক'রে দিতে আসে না। আমি যেন সংসার-স্বর্গ সৃষ্টি করেও অমৃত লাভে বঞ্চিত হয়েছি!"

নরেশের বুকফাটা অভাব ও অভিযোগের এই মর্ম্মন্তুদ কাহিনী কমলার ডাগর আঁখি দু'টিকে অশ্রুজলে ভরিয়া তুলিয়াছিল। গোপনে তাহা মুছিয়া ফেলিয়া সহাস্য মুখে কমলা বলিল, "মাভৈ, নরেশদা, এইবার তুমি অমৃত লাভ ক'রে অমর হবে,—আমি তোমায় বর দিলুম।"

"অর্থাৎ—?"

"অর্থাৎ লীলার মতিগতি এইবার ফিরেছে ব'লে বোধ হচ্ছে, কাজে কাজেই সেই সঙ্গে তোমার কপালও ফিরতে সুরু হচ্ছে—"

"কি বলছ তুমি কমলা?"

"বলছি ঠিক্। ঐ দেখ লীলা আস্ছে—"

দ্বিতীয়াংশ

২

লীলা মজুমদার মহাশয়ের খোলা চিঠিখানা হাতে করিয়া কমলার কাছে গিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল "বাবা, মা, দু'জনে দেশ ভ্রমণ করতে যাচ্ছেন, যাবার পথে আমাদের বাড়ী হয়ে যাবেন লিখেছেন।"

"এখানে আসবেন? কবে রে?"

"কাল চিঠি লিখেছেন আজ ভোরে বেরুবেন। তা যদি বেরিয়ে থাকেন, তা হ'লে বোধ হয় এখনি এসে পৌছবেন। চিঠিখানা এতো দেরীতে এলো যে কোন-কিছু ব্যবস্থা করবার আর সময় নেই! এখন কি করি বৌদি বল তো? তাঁরা এসে প'ড়ে যদি এই রকমটা দেখেন—"

"নরেশকে বল্‌না।"

"আমি পারবো না!"

"তবে কে বল্‌বে?"

"তুমি বলো।"

"আমি কেন বলবো?—বা রে, বেশ মেয়েতো!" বলিতে

বলিতে কমলা ডাক দিল, "ও নরেশ! লীলা তোমাকে কি একটা কথা বলবার জন্তে এসেছে—এদিকে শোনো!"

লীলা ঘরে ঢুকিতেই নরেশ সেদিকে পিছন করিয়া তফাতের একটা জানালার ধারে সরিয়া দাঁড়াইয়া এতক্ষণ যেন এক-মনে আকাশের রঙ্গপটে মেঘের অভিনয় দেখিতেছিল। কমলার ডাক শুনিয়া সচকিতে ফিরিয়া দাঁড়াইল।

লীলা তখন তাহার বৌদিদিকে চোখ রাঙাইয়া যেন বলিতেছিল "ও মাগো!—কি মিথ্যেবাদী গা তুমি!"

নরেশ দ্বিধা ও সঙ্কোচের সহিত একটু একটু করিয়া কাছে আসিয়া একবার লীলার মুখের দিকে একবার কমলার মুখের দিকে অসহায়ের মত চাহিতে লাগিল!

নরেশ কাছে আসিতেই লীলা মুখটি হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কমলা তখন তাহার সেই আনত মুখখানির চিবুক ধরিয়া উপর দিকে ঠেলিয়া তুলিয়া কহিল—"বল্‌না লো,—কি বল্‌বি!"

"যাও!" বলিয়া লীলা তাহার চিবুক হইতে কমলার হাতখানি সরাইয়া দিয়া তাহার দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল ও নত মুখে হাতের চিঠিখানা আবার মনে মনে পড়িতে লাগিল।

নরেশ কি করিবে স্থির করিতে পারিতেছিল না—এমন সময় কমলার চ'খের ইঙ্গিতে উৎসাহিত হইয়া সে আবার ঘুরিয়া লীলার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল এবং মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল "ব্যাপার কি?

ও কার চিঠি?" লীলা চিঠিখানা নরেশের হাতে তুলিয়া দিয়া হেঁট হইয়াই বলিল "বাবার; তাঁরা সব এখানে আস্‌ছেন।"

"আমাদের বাড়ী?"

"হ্যা।"

"কবে?"

"আজ। বোধ হয় এখনি এসে পৌছবেন।"

"বাঃ!—আর কেউ তোমরা সেটা এতক্ষণ আমাকে বলনি! ষ্টেসনে একটা লোক গেল না, একখানা গাড়ী গেল না, বেশ তো!" বলিয়াই নরেশ চিঠিখানা পড়িতে পড়িতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, এবং তৎক্ষণাৎ জুতা জামা পরিয়া আসিয়া চিঠিখানা কমলার হাতে ফেরত দিয়া বলিল "তা'হলে আমি এখন চল্লুম বৌদি। তাঁরা যে ক'দিন থাকেন, খুব আদর যত্ন করবে, দেখো যেন তাঁদের কোনও কষ্ট না হয়। ছট্টুকে গাড়ী নিয়ে ষ্টেসনে পাঠিয়ে দিলুম। খরচপত্র যদি হাতে বেশী না থাকে, তা'হলে এই নাও আরও শ'দুয়েক টাকা কাছে রেখে দাও। আমার কথা যদি জিজ্ঞাসা করেন, তাহ'লে বোলো যে, কারবারের দরুণ কি মাল-পত্র কিন্‌তে বিদেশে গেছে, ফিরতে দেরী হবে—" নরেশের কথা শেষ হইবার আগেই ধীরে ধীরে লীলা আসিয়া তাহার হাত ধরিল। শরাহত পক্ষীর মত করুণ নেত্রে স্বামীর

দিকে চাহিয়া রোদনরুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি থাক্‌বে না কেন? কোথা চ'লে যাচ্ছ?"

"যেদিকে দু'চক্ষু যায়! তাঁরা যখন এখানে আসছেন, তখন আমি আর কি ক'রে থাকি বল?—মনে নেই, যেদিন জোর করে তোমায় নিয়ে চলে এলুম, তাঁরা আর আমার মুখ-দর্শন করবেন না বললেন? আর তুমিও তো সেদিন থেকে আমার মুখ দেখা বন্ধ করে দিয়েছো! তুমি আর তোমার বাপ-মা আমার ওপর যে রকম সদয়, তাতে এ সময় আমার উপস্থিতিটা এখানে বোধ হয় তোমাদের কারুর পক্ষেই বিশেষ প্রীতিকর হ'বে বলে তো আমার মনে হচ্ছে না!"

"তা হোক্, তোমাকে থাকতেই হবে।"

কমলাও লীলার সহিত যোগ দিয়া বলিল "নিশ্চয়! বাড়ীতে যখন অতিথি আস্‌ছে, তখন বাড়ীর কর্ত্তার কি পালানো উচিত?"

নরেশ বলিল, "তাঁরা তো এখন কিছু দিন এখানে থাক্‌বেন?"

লীলা বলিল, "থাক্‌বেন বই কি; এতদিন পরে যখন আস্‌ছেন এখানে, আমি কি তাঁদের শীগ্‌গির ছেড়ে দেবো মনে করেছো? হাঁ—ভাল কথা; দেখ, তোমার যদি কোনও আপত্তি না থাকে, তাহ'লে ঐ দক্ষিণের বড় শোবার ঘরখানা তাঁদের জন্যে গুছিয়ে নিই।"

"তা বেশ তো, দাও না,—ও ঘরখানা হ'য়ে পর্যন্ত ত' আর তোমার অনুগ্রহে ব্যবহার করা ঘটে উঠেনি। তুমি ত এ বাড়ীতে ঢুকে অবধি বৌদির ঘরেই আস্তানা নিয়েছো, আর আমিও নিরুপায় হ'য়ে বৈঠকখানায় আড্ডা গেড়েছি!"

কমলা বলিল "ওঁরা এলে যেন আর বৈঠকখানায় শুতে যেয়ো না।" নরেশ হাসিতে হাসিতে বলিল, "তবে কি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবো বৌদি?"

"কেন, রাস্তায় রাস্তায়ই বা ঘুরতে যাবে কেন। আমার ঘরেই এ ক'দিন তোমরা দু'জনে শোবে। আমি ওই পূবের দালানটায় একখানা মাদুর বিছিয়ে আমার ব্যবস্থা করে নেবো এখন, সে সব ঠিক বন্দোবস্ত করে ফেলছি আমি এখনি—" বলিতে বলিতে কমলা সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। নরেশ তখন পাশের একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া লীলাকে বলিল "দেখ, আমি তবে তোমাকে সব কথা খুলে বলি শোনো, রাগ কোরো না যেন। অনেক দিন বাপ মাকে দেখনি, তাঁদের ছেড়ে এসে পর্য্যন্ত এক দিনের জন্যেও আমার কাছে তোমার মন টিকছে না,—আজ যখন তাঁরা নিজেরাই তোমার কাছে আসছেন, তাঁদের দু' দিন আটকে রাখবে, ভাল করে খাওয়াবে-দাওয়াবে, আদর-যত্ন করবে—এটা খুবই স্বাভাবিক—আর সব মেয়েরই করা উচিত। কিন্তু আমি হলুম কি জানো, তাঁদের এখন

ত্যাজ্যপুত্র-জামাই! আমার ওপর তাঁরা রেগে আছেন; সুতরাং আমাকে দেখলে যে তাঁরা আরও চটে যাবেন, এটাও ঠিক। সুতরাং আমার এ ক'টা দিন বাড়ী থেকে সরে থাকাই ভালো। তবে এখনি তাড়াতাড়ি চলে যেতে হচ্ছে বলেই একটু অসুবিধে হবে, আর কিছু নয়। এটাও হোতো না—যদি তুমি দয়া ক'রে দু'দিন আগে এ খবরটা আমায় দিতে! যাক্ এখনও সময় আছে। কিন্তু আমার বোধ হচ্ছে, তাঁরা ঠিক তোমার সঙ্গে দেখা করতেই আসছেন না, বোধ হয় তোমাকে নিয়ে যাবার জন্তেই আস্‌ছেন, আর তুমিও যে তাঁদের কাছে যাবার জন্তে পা বাড়িয়ে বসে আছো, সে বিষয়েও আমার কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার অবস্থাটা যে কতদূর শোচনীয় হবে, তা বোধ হয় একবারও ভেবে দেখনি? এই সবে নতুন ঘর-বাড়ী ফেঁদে বসিছি। এ সব ভাসিয়ে দিয়ে চলে যাওয়া হয় ত' তোমার পক্ষে কিছুই নয়; কিন্তু সে ব্যাপারে আমার প্রাণটা যে কত বড় ঘা খাবে, এটা তো অন্ততঃ তোমার একবার ভেবে দেখা উচিত ছিল! ফস্ ক'রে আমাকে না ব'লে-ক'য়ে একেবারে তাঁদের এখানে নিয়ে আসবার যে কি দরকার পড়েছিল, তা তো আমি এখনও বুঝতে পার্‌ছিনি। আর আন্‌লেই যদি, তা ছাই আমাকে একটু আগে থাক্‌তে সেটা বলা উচিত ছিল তো—আমাকেও তো আবার এ দিকের সব গোছগাছ করতে হবে?"

লীলা প্রায় কাঁদো কাঁদো হইয়া বলিল, "আমি তো আজ এই মাত্র তাঁদের চিঠি পেয়ে জান্‌তে পারলুম যে, তাঁরা আস্‌ছেন। আমি তো তাঁদের এখানে আস্‌বার জন্যে এক দিনও কিছু লিখিনি!"

নরেশ বলিল, "আস্‌বার জন্যে না লিখলেও, অন্ততঃ তোমার যে এখানে মন টিঁকৃছে না—থাকতে খুবই কষ্ট হচ্ছে, অসুবিধে হচ্ছে—এ সব বোধ হয় প্রতি হপ্তায় লিখতে?—তাঁরা ক্রমাগত সেই সব শুনে ব্যস্ত হ'য়ে তোমায় নিয়ে যেতে আসছেন বোধ হয়।"

"আমি আজ পর্য্যন্ত চিঠিতে তাঁদের কাছে কখনও কোনও কষ্টের কথাই লিখি নি!"

"তবে বোধ হয় তোমার আমার দাম্পত্য-জীবনের বর্ত্তমান অবস্থাটা উপস্থিত যেরকম দাঁড়িয়েছে, তার সঠিক সংবাদটুকু তাঁদের কাছে পাঠিয়েছিলে?"

"এক দিনও তা জানাই নি।"

"সে কি?—সত্যি? তবে রোজ যে একখানা ক'রে চিঠি রাজনগরে যেতো, তাতে কি তুমি লিখতে বল' তো?"

"বিশেষ কিছুই না। আমরা সব এখানে বেশ ভাল আছি, কোনও কষ্ট হচ্ছে না, বৌদি খুব যত্ন করছেন—এই সব।"

নরেশ অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বল কি লীলা?

শুধু এই কথা লিখ্‌তে? আর কিছু না? সত্যি বলছো?—আজ এই এক বছর ধরে তুমি এখানে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আছো, কোনও কষ্ট হচ্ছে না—এই রকম সুখবরই তাঁদের বরাবর দিয়ে এসেছো? বাঃ! লীলা! তুমি দেখছি তা হ'লে তাঁদের কাছে আমার মুখ রক্ষে করেছো,—আমায় মাপ কর, আমি তোমার উপর অন্যায় অবিচার করেছিলুম!"

"আমি আমাদের পরস্পরের এই মনের অবস্থা আর আমাদের ভিতরের শোচনীয় বিরোধটা তাঁদের কিছুমাত্র জানতে দিইনি, এই জন্যে যে, পাছে তা শুনে তাঁদের মনে আরও বেশি কষ্ট হয়।"

"ওঃ! তাই বলো। পাছে তাঁদের আরও কষ্ট হয় এই জন্যে জানাওনি, তা বেশ করেছো—কিন্তু এইবার তো তাঁরা এসে স্বচক্ষে আমাদের বর্ত্তমান অবস্থাটা দেখে যাবেন?"

"তাঁরা তো এখানে বেশি দিন থাক্‌বেন না। দেশ ভ্রমণ করতে বেরিয়েছেন—দু' এক দিন পরেই চলে যাবেন।"

"তোমাকেও কি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবেন?"

"তা জানি নি; যদি নিয়ে যান তা হ'লে তুমিও আমাদের সঙ্গে যাবে কি?"

"আমি যাব?—হাঃ হাঃ হাঃ,—তুমি হাসালে লীলা! আমাকে তাঁরা নিয়ে যাবেন কেন?—আমি যে এখন তাঁদের দু'

চক্ষের বিষ !—কিন্তু তুমি—তুমি কি :তবে সত্যিই তাঁদের সঙ্গে চলে যাবে ঠিক করেছো ?—তা যেয়ো—কিন্তু আমার দুর্দ্দশা কি হবে তাই ভাব্‌ছি।—একলাটি পড়ে থাক্‌তে হবে বোধ হয় ! তাই তো !—কে সব দেখ্‌বে, শুন্‌বে, কর্‌বে, কর্ম্মাবে ?—নাঃ, বৌদি থাক্‌বে নিশ্চয়, সে কখনই আমাকে একলা ফেলে রেখে চলে যাবে না। উঃ—বৌদি না থাক্‌লে আমি কি এত দিন এ বাড়ীতে এক বেলাও তিষ্ঠুতে পারতুম ?—তুমি তো এখানে থেকেও নেই, সেই তো আমার সমস্ত সংসারটাকে ঘাড়ে ক'রে রেখেছে ! ভাগ্যি বৌদি তখন আমাদের সঙ্গে এসেছিল, নইলে কি হ'তো বল তো ?—সেই 'গরীবের মেয়ে' ব'লে নতুন উপন্যাসখানার—স্বামী-স্ত্রীর মতো আমাদের দুর্দ্দশা হ'তো আর কি !"

লীলা যেন হঠাৎ শিহরিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি বলিল, "না—না, তা হতেই পারে না,—বৌদিকে তাঁদের সঙ্গে যেতেই হবে। তাঁরা লিখেছেন যে ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন।"

নরেশ উত্তেজিত ভাবে বলিল, "বাঃ ! তা কি ক'রে হবে ? এখানে তাহ'লে কে দেখবে শুনবে ? একজন না থাক্‌লে কি চলে ?"

অভিমান করিয়া লীলা বলিল, "তুমি দেখছি তাহ'লে আমার যাওয়াটা বন্ধ করতে চাও ?"

নরেশ চোখ দুটি কপালে তুলিয়া একপ্রকার ভীত মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, "বাপ্‌রে! সে কি আমি বারণ করতে পারি? একেই তো বারোমাস মুখ ভার করে রয়েছো; আমায় তো এক রকম 'তাল্লাক্' দিয়েছো বল্‌লেই হয়। তার ওপোর আবার বেড়াতে যাওয়া বন্ধ করলে কি রক্ষে আছে? কোন দিন শেষ কেরাসিন তেলের যজ্ঞ ক'রে বস্‌বে? তোমার যাবার ইচ্ছে থাকে নিশ্চয় যাবে; আর আমি তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে জোর করে কিছু করছিনি! একবার স্বামীগিরি ফলাতে গিয়ে যে শাস্তিটা এখনও ভোগ করছি—আর কি ভুলেও সে কাজ করি? কিন্তু বৌদিকে আমি কিছুতেই যেতে দেবো না। বৌদি না থাক্‌লে এক দিনও আমার সংসার চলবে না। তুমি যেতে চাও যাও, কিন্তু বৌদির যাওয়া কিছুতেই হতে পারে না।"

রাগে অভিমানে অপমানে আঘাতে লীলার ঠোঁট দু'খানি ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। তীব্র অনুযোগের কণ্ঠে সে বলিতে লাগিল, "তা আমি জানি, তুমি আর আমাকে এখানে রাখ্‌তে চাওনা, সরিয়ে দিতে পারলেই যেন বাঁচো! আমি ছাড়া আর যে কেউ হোক্ তোমার সংসার বেশ চালাতে পারবে; কেন না আমি এখন তোমার সংসারের বোঝা হয়ে উঠেছি কি না?—কিন্তু শুনে তুমি ভারি হতাশ হবে—যে আমি এখন তাঁদের সঙ্গে কোথাও যাচ্ছিনি! এইখানেই থাকবো ঠিক করিছি!"

লীলার এই অপ্রত্যাশিত নূতন রূপ দেখিয়া নরেশ অতি মাত্র বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "সে কি! তুমি যাবে না? এইখানেই থাকবে ঠিক করেছো? আমার কাছেই? এই বাড়ীতে, না ওখানে?"

"ওখানে গিয়ে থাকলেই বোধ হয় তুমি খুসী হও; তোমার বেশ সুবিধে হয়, না? কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে আমিও এ বাড়ী থেকে নড়ছিনি! এইখানেই থাকবো মনে করছি,—বুঝলে?"

নরেশ অধিকতর বিস্ময়ে ও সন্দেহে আন্দোলিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "তাই নাকি? বটে! তুমি যে আমাকে আজ অবাক্ করে দিচ্ছ! হঠাৎ তোমার এ সুমতি হল কি ক'রে? তাঁরা বোধ হয় তোমাকে এই রকম উপদেশ দিয়েছেন, না? বাপ-মরি কথা রাখতে, তাঁদের ইচ্ছে অনুসারেই বোধ হয় কৃপা করে তুমি আমার উপর এই অনুগ্রহটুকু করতে রাজি হয়েছো?"

লীলা ইহার উত্তরে বেশ জোর করিয়াই বলিল, "আমি আমার নিজের ইচ্ছেতেই এখানে থাকছি। কারুর উপদেশে বা অনুরোধে নয়, আর এরকম উপদেশও কেউ আমাকে দেয় নি।"

নরেশ আনন্দে বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া লীলার মুখের দিকে বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া রহিল।

এমন সময় কমলা সেখানে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "তাঁদের থাকবার সব বন্দোবস্ত করে ফেললুম। তুমি আমার ঘরেই

শোবে, তোমার খাটখানা বাইরে থেকে চাকরদের দিয়ে আনিয়ে নিয়েছি। আর ও ঘরের বড় পালঙ্কখানাতে তাঁদের জন্যে বিছানা করিয়ে রাখলুম। এখন তুমি যেন শ্বশুরের ভয়ে পালিয়ো না।" বলিয়া কমলা খুব হাসিয়া উঠিল।

নরেশ লীলার দিকে চাহিয়া বলিল, "তা আমি যে সেটা এখনও ঠিক করতে পারছিনি! তুমি কি বল? আমার তো মনে হয় এ ক'টা দিন গা ঢাকা দিতে পারলেই ভাল হয়।"

এবার কমলা রাগ করিয়া বলিল, "বেশ, যাও, তাহ'লে আমিও এইবেলা স'রে পড়ি। একখানা ভাড়া-গাড়ী ডেকে আনুক, শিবপুরে আমার ন'মামার কাছে এ ক'টা দিন থাকিগে!"

লীলা যেন বিরক্ত হইয়া বলিল, "বৌদি! তুমি স'রে যাবে বল্‌ছো কিসের জন্যে শুনি?"

নরেশও লীলার সহিত যোগ দিয়া বলিল "তা বই কি! তুমিও সরে যাবে কি রকম?"

কমলা বলিল "আমি বাপু তোমাদের এসব গণ্ডগোলের ভিতর থাক্‌তে চাইনে! একবার কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করবেন 'ব্যাপার কি?' একবার গিন্নী জান্‌তে চাইবেন—'কি হ'য়েছে গা বৌমা?' আমি বাপু তোমাদের জন্যে তাঁদের কাছে সাত-সতেরো মিছে কথা বলতে পারবো না! আর ও মেয়েটী যে রকম কেলেঙ্কেরে, হয়ত' কখন কি ব'লে ফেল্‌বে, আর আমার অপদস্থর সীমা থাক্‌বে না!"

নরেশ বলিল "না বৌদি! লীলাকে তুমি অতটা আহাম্মুক ঠাউরো না। তুমি যখন ওর গুরু, হাতে ক'রে ওকে গ'ড়ে পিটে যখন মানুষ করেছো—"

লীলা ইহাতে তীব্র আপত্তি প্রকাশ করিয়া বলিল—"উনি কেন আমার গুরু হ'তে যাবেন? পোড়া কপাল আর কি!— আমাকে আবার হাতে ক'রে উনি গ'ড়ে পিটে মানুষ করলেন কবে?"

লীলার এই অশিষ্ট প্রতিবাদে অপ্রতিভ হইয়া নরেশ বলিতে লাগিল, "তা সে না হ'লেও উনি তোমাকে কিন্তু খুব স্নেহ করেন লীলা! সাধ্যমত তোমার গায়ে একটি আঁচড়ও লাগতে দেন না। বৌদির মত শুভাকাঙ্ক্ষীও বোধ হয় আর তোমার কেউ নেই।"

রাগে মুখ বিকৃত করিয়া লীলা বলিল, "ছাই! শালুক চিনেছেন গোপালঠাকুর! যার মুখে মিষ্টি ভেতরে ছুরি, সে আবার শুভাকাঙ্ক্ষী!"

হঠাৎ লীলার এই তীব্র উষ্মার কোনও সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া না পাইয়া নরেশ যেন হতভম্ব হইয়া গেল! কমলার প্রতি লীলা যে অবিচার করিতেছে, এজন্য বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইয়া খুব ধীরে ধীরে নরেশ বলিল, "তুমি এ ভারি অন্যায় কথা বল্‌ছো লীলা! বৌদি তো কখনও তোমার সঙ্গে কোনও প্রবঞ্চনা করেন নি! এক দিনও তোমার কিছু অনিষ্ট করেন নি—"

নরেশের কথায় বাধা দিয়া অধৈর্য্য ভাবে লীলা বলিয়া উঠিল,

"অনিষ্ট করেনি ?—কি জানো তুমি ? কার জন্যে আজ আমার এই অবস্থা ? ওর দোষেই তো আমার জীবনটা আজ এমন অসুখী হয়ে উঠেছে !"

নরেশ তাড়াতাড়ি লীলার মুখে হাত চাপা দিয়া বলিল, "ছিঃ ছিঃ ! চুপ কর ; কি বলছ' তুমি লীলা ?"

লীলা নরেশের হাত সরাইয়া দিয়া বলিল, "হ্যাঁ গো হ্যাঁ, জানি, তুমি তো ওর দোষ দেখতে পাবে না। ওর ওপোর যে তোমার টানটা বড্ড বেশি—তুমি তো ওর হয়ে বল্‌বেই—কিন্তু আমি তো ভুলিনি যে কার পরামর্শ পেয়ে আমি বিবাহে মত দিয়েছিলুম ! কে আমার কাণে বিষমন্ত্র দিয়ে আমাকে আজ এই অসহ্য যন্ত্রণার ভিতর টেনে এনেছে ! ওর কথা যদি আমি তখন না শুনতুম, তা হ'লে তো আজ আমাকে বাপ মার আশ্রয় ছেড়ে এসে এই পরের বাড়ী অন্যের গলগ্রহ হ'য়ে থাকতে হোত না ? তাড়াতাড়ি আমার বিয়ে দেবার জন্যে ও যে কেন তখন অমন উঠে-পড়ে লেগেছিল, এখন আমি তার আসল কারণ কতকটা বুঝতে পেরেছি। কত দিন আর ও আমার চোখে ধূলো দিয়ে রাখবে ? ও যে বল্‌তে না বল্‌তে পুঁটুলি-পাট্‌লা বেঁধে আমার সঙ্গে এখানে চলে এসেছে, সে কি তুমি মনে কর কেবল আমাকে দেখবার শোন্‌বার জন্যে, না আমার নতুন ঘর-কন্না গুছিয়ে দেবার জন্যে ? সে সবই ওর ছল ! ও নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে এখানে

এসেছে—সে কি আমি জানি নি ? আমাকে যত দেখুক না দেখুক, দিনরাত তোমার পরিচর্য্যা নিয়েই তো ও ব্যস্ত থাকে দেখতে পাই ! কেন, আমার চেয়ে তোমার ওপর কি ওর বেশি টান ? অত দরদ তোমার ওপর ওর কেন, সে কি আমি বুঝতে পারিনি মনে কর ? তোমরা দুজনে মিলে রাতদিন আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছো ! আমি সব টের পেয়েছি। তোমরা যে আমাকে ছেলেমানুষ মনে ক'রে আমাকে নিয়ে যা তা করবে, সে আর আমি হ'তে দিচ্ছিনি। উনি যে মৎলবে আজ একখানা বটতলার পচা বই এনে আমাকে প'ড়ে ভয় দেখাচ্ছিলেন যে, শেষটা আমাদেরও অবস্থা দাঁড়াবে ওই রকম, তাতে আমি একটুও ভয় পাই নি। যদি তাই হয় হোক্ না—আমার তাতে কিছুই যায় আসে না। কিন্তু এটা তোমরা ঠিক জেনো যে, আর একজনের ভালবাসা পাবার জন্যে কাঙাল ভিক্ষুকের মতো লালায়িত হ'য়ে বেড়াবার আগে আমি বিষ খেয়ে মরবো। আমি কখনই তোমাদের মনের বাসনা পূর্ণ হ'তে দিচ্ছিনি। এখনি মা আসবেন, বাবা আসবেন—তাঁরা এসে যখন চোখের উপর এই সব কাণ্ড দেখ্‌বেন, তখন বেশ হবে, আমি তাই চাই, তবেই যদি তোমরা জব্দ হও—" বলিতে বলিতে লীলা কাঁদিয়া ফেলিল, মুখের ভিতর আঁচল পুরিয়া দিয়া ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে সে ঘর হইতে ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

নরেশ স্তম্ভিত হইয়া অনেকক্ষণ সেদিকে চাহিয়া থাকিয়া তার পর কমলাকে জিজ্ঞাসা করিল, "লীলার এ কি রকম কাণ্ডকারখানা বৌদি ?"

কমলা কিন্তু লীলার এই কাণ্ডকারখানা দেখিয়া মনে মনে খুসিই হইয়াছিল। লীলার সমস্ত অনুযোগ সে চুপটি করিয়া শুনিয়াছে এবং তাহার অজ্ঞাতসারে কেবলই মুখ টিপিয়া হাসিয়াছে,—একটি সামান্য প্রতিবাদও করে নাই। নরেশের প্রশ্ন শুনিয়া হাসি মুখেই কমলা উত্তর দিল—"আমাকে ও আর দু'চক্ষে দেখতে পারে না।"

"সে কি! ক'দ্দিন ?"

"প্রায় এ বাড়ীতে আসবার পর থেকেই—দিন দিন আমি ওর দু' চক্ষের বিষ হ'য়ে উঠিছি!"

"না—না; সত্যি বল; যথার্থই কি ও তোমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছে ?"

"অন্ততঃ তোমার চেয়েও আমার ওপর বেশি সন্তুষ্ট নয়।"

"সে কি কমলা! তোমাকে অত ভালবাস্‌তো ও!"

"এখন তেমনি ঘৃণা করে! আমার ওপর ওর এখন দস্তুর মত একটা আক্রোশ হয়েছে!"

"তোমাকে ও যেন একটু সন্দেহের চক্ষে দেখে বলে মনে হ'ল।"

"একটু নয়—ভয়ানক রকম !"

"কি আশ্চর্য্য ! তোমার উপরেও ওর সন্দেহ !"

"নইলে আর কার উপর হবে ?"

এ প্রশ্ন শুনিয়া নরেশ অনেকক্ষণ কমলার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। তাহার ভাবগতিক দেখিয়া কমলার অধর-কোণে হাসির গোপন রেখা ফুটিয়া উঠিল। সে তখন মুখখানি অন্য দিকে ফিরাইয়া লইল। নরেশ মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে ইতস্ততঃ করিয়া বলিতে লাগিল—"কিন্তু তার এরকম মনে হবার কোনও কারণ তো কোনও দিন ঘটেনি !—সন্দেহের ছায়ামাত্র যেখানে কখনও—"

নরেশের কথা শেষ হইবার আগেই হাসি মুখখানি তাহার দিকে ফিরাইয়া কমলা বলিল, "সে জন্যে আর তোমার এতো দুর্ভাবনা কেন ? তোমার তো বরং এতে খুসি হবারই কথা ! ও যে আমাকে সন্দেহ ক'রে একটু চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে; এর ফলে তোমারই তো শেষটা ভাল হবে !"

"বল কি কমলা ! লীলার এ রকম অকারণ সন্দেহ করা খুবই অন্যায় ! তা ছাড়া এটা এতবড় একটা লজ্জার বিষয় ! এর পরিণাম তো আমি কিছুতেই ভাল ব'লে বুঝছিনি !"

"তোমরা হ'লে বেটাছেলে, মেয়ে মানুষের মনের কথা আমরা তোমাদের বুঝিয়ে না দিলে কি তোমরা কোনও দিন বুঝতে

পারো ?—এই যে আমার ওপোর ওর একটা সন্দেহ হ'য়েছে, এই সন্দেহ তার মনে আমার বিরুদ্ধে একটা বিদ্বেষ জাগিয়ে তুলেছে। সেই বিদ্বেষ ওকে এখন উন্মত্ত করে তুলেছে— আমাকে অতিক্রম ক'রে তোমাকে সব দিক দিয়ে জয় করবার জন্যে ! এইবার ও তোমাকে সত্যিই ভালবাসতে সুরু করেছে !"

"এ্যাদ্দিনে ?"

হ্যাঁ, এ্যাদ্দিনে। বে'র আগে তোমার প্রতি ওর যে ভালবাসাটুকু ছিল, সেটা হ'চ্ছে বাইরের জিনিস, সেদিন ওর অন্তরের সঙ্গে তার কোনও যোগ হ'য়ে ওঠেনি। আজ আমার উপর তার এই সন্দেহজনিত বিদ্বেষের আক্রোশ ওর বাইরের সঙ্গে অন্তরের একটা নিবিড় যোগ সাধন ক'রে দিয়েছে। প্রেমের গভীরতা অনেক সময় এই পথেই প্রাণের অন্তঃপুরে প্রবেশ করবার সুযোগ পায় ! কোনও জিনিস যখন আমরা হারাতে বসি নরেশদা, তখনই সেটার ওপর আমাদের মায়া যেন সবচেয়ে প্রবল হ'য়ে ওঠে, অথচ তার আগের মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত হয়ত আমরা তাকে নিতান্ত অনাদর ক'রেই এসেছি ! লীলারও আজ মনের অবস্থা তাই। তোমাকে সে যতদিন পেয়েছিল, অবহেলাই ক'রে এসেছে। কিন্তু আজ তার সন্দেহ হয়েছে বুঝি বা তোমাকে হারায়। তাই সে তোমার জন্যে আশঙ্কায় সজাগ হ'য়ে .উঠেছে ! আমার ওপর ওর এই বিদ্বেষ, তোমার

প্রতি ওর আন্তরিক আকর্ষণেরই একটা রূপান্তর বইতো নয়!”

কমলার প্রতি কৃতজ্ঞতায় নরেশের দুই চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া নরেশ বলিল “বুঝেছি কমলা, আমার লীলা এইবার সবদিক দিয়ে আমার কাছে ধরা দেবে; আমার এই বিড়ম্বিত জীবন এইবার সার্থকতার চরম আনন্দ লাভে চরিতার্থ হ’বে—কিন্তু ভাই এর অসম্ভব মূল্য যে তোমাকে দিতে হচ্ছে তোমার অপযশের বিনিময়ে! এতবড় ক্ষতিও কি তুমি সহ্য করবে এই অভাগার জন্যে?”

ম্লান হাসি হাসিয়া কমলা বলিল “জীবনের কারবারে হাত দিতে না দিতে যার ভরাডুবি হ’য়ে গেছে নরেশদা, তোমাদের প্রেমের মহাজনি করে তাকে যদি দেউলেই হ’তে হয়—তাতে আর তার এমন কি বেশি ক্ষতি হ’বে ভাই?”

মমতায়, বেদনায়, প্রশংসায় নরেশের হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। অনেকক্ষণ সে আর কোন কথা কহিতে পারিল না। তারপর অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত বলিল, “যদি কিছু না মনে কর, তাহ’লে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।”

“কি বল?”

“জীবনে কখনও ভালবাসার যথার্থ আস্বাদ পেয়েছিলে কি?”

প্রশ্ন শুনিয়া কমলা যেন শিহরিয়া উঠিল! অনেকক্ষণ কি

ভাবিয়া, একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "হ্যাঁ ভাই, আমিও এক দিন একজনকে ভালবেসেছিলুম আমার সমস্ত জীবন দিয়ে।"

"অসুখী হয়েছিলে নিশ্চয়।"

"সুখী হতে পারিনি বটে, কিন্তু এ কথা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করবার উদ্দেশ্য কি তোমার?"

"দেখ, আমার ধারণা, যারা ভালবাসার আগুনে পুড়েছে, কেবল তাদেরই মন থেকে স্বার্থের বিষাক্ত অজগরটা জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়; আর তাদের দ্বারাই কেবল জগতের যথার্থ কল্যাণ সাধিত হতে পারে।"

"তোমার ধারণা মিথ্যে নয়; ভালবাসা জীবনের একটা মস্ত বড় অভিষেক—যা মানুষের মনের সমস্ত ক্ষুদ্রতার অগ্নিসংস্কার ক'রে তাকে উদার ও মহৎ ক'রে তোলে। কিন্তু সে যে কেবল এই পথ ধরেই চলে, এই দিক দিয়েই শুধু জগতের উপকার করে, তা যেন মনে কোর না।"

"না—না, সে আমি জানি; আর এও জানি যে, অনেক সময় তারা কেবল জগতের যন্ত্রণা আর দুঃখই বাড়িয়ে তোলে—শান্তি ও আনন্দের ব্যাঘাত উৎপাদন করে!"

"তা ক'রে বটে, কিন্তু সে কারা জানো?—যাদের মধ্যে প্রেম বলে জিনিসটা আর থাকে না, লালসা যাদের গর্ব্বকে পঙ্কিল করে দিয়েছে, যারা আত্মসম্মান হারিয়েছে।"

আনন্দে বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া নরেশ বলিতে লাগিল, "আশ্চর্য্য! যতই তোমার অন্তরের পরিচয় পাচ্ছি,—যতদূর নিবিড় ভাবে তোমার ভেতরটা দেখ্‌তে পাচ্ছি—যতটুকু স্পষ্ট ক'রে তোমায় জান্‌ছি—ততই যেন মনে হচ্ছে, আরও কত আছে তোমার মধ্যে জান্‌বার, বোঝ্‌বার, শেখবার! তোমার সঙ্গে সম্পূর্ণ ভাবে পরিচিত হওয়া বুঝি জন্মজন্মান্তরের কাজ! আর কেবলই ভাব্‌ছি—কি ভাব্‌ছি জানো?—ভাবছি সে কি হতভাগ্য, যে তোমার অমূল্য প্রেমের মর্য্যাদা বুঝ্‌তে না পেরে, তোমাকে হেলায় প্রত্যাখ্যান করেছে!"

"আমি কিন্তু সেই জন্যেই তার কাছে আরও চিরকৃতজ্ঞ হ'য়ে আছি নরেশদা! সে যদি আমাকে গ্রহণ করতে চাইতো, তা হ'লে আমার যে কি সর্ব্বনাশ হোতো, সে কারুর ধারণাই হবে না ভাই। প্রেমের সার্থকতাটাই সব সময়ে জীবনের সাফল্য এনে দেয় না,—সে ধ্বংসও করে। তাই আমিও সেটাকে বিশেষ ক'রে কোন দিনই চাই নি।"

"তুমি তবে কি চেয়েছিলে কমলা?"

"আমি যা চেয়েছিলুম, তা যারা চায়, তারা কেউই সেটা কোনও দিন ঠিক বুঝিয়ে বল্‌তে পারে না। অনেক সময় তারা নিজেরাই হয় ত নিশ্চয় করে বুঝ্‌তে পারে না যে, তারা যথার্থই কি চাইছে! আমিও বোধ হয় সেদিন কি চেয়েছিলুম, তা কোন

দিনই বুঝ্‌তে পারতুম না, যদি না দয়া করে সে আমাকে প্রত্যাখ্যান কর্‌তো !"

"আচ্ছা, আর একটি কথা বল্‌বে ?"

"বল।"

"সেদিনের স্মৃতি কি তোমাকে কোনও দিন চঞ্চল ক'রে তোলে না ? সেই পুরোনো আশা-আকাঙ্ক্ষার জ্বালা-যন্ত্রণা কি একেবারে চিরদিনের মতো জুড়িয়ে গেছে ? উত্তেজনার অসহ্য আঘাত লেগে তোমার ক্ষত মর্ম্মস্থল কি আর সেদিনের মতো রক্তাক্ত ও বেদনাতুর হ'য়ে ওঠে না ? কোনও সাধ—কোনও বাসনার বিষাক্ত নাগিনী কি তোমার বুকের ভেতর গরলের ফণা তুলে আর এক দিনও গর্জ্জে ওঠে না ? দেহের দৈত্যগুলোও কি সব তোমার পূত শুভ্র রূপোর কাঠির স্পর্শে অসাড়ে ঘুমিয়ে পড়েছে কমলা ?"

"পূত শুভ্র নিরাভরণ বেশ যদি মনের রাঙা রংটাকে বদ্‌লে দিতে পারতো নরেশদা,—তা হ'লে আমাদের সমাজের অনেক গ্লানি, অনেক অধঃপতন পাপের তালিকায় কোনও দিনই দেখ্‌তে পাওয়া যেতো না ! গৈরিক যেমন সন্ন্যাসীকে কেবল সতর্ক করে রাখে মাত্র, আমাদেরও এই বিধবার বেশ তার চেয়ে বেশী করতে পারে না। তবে যদি বল তবু আমাদের পদস্খলন হয় কেন, তার কারণ আমরা সংসার-ত্যাগী বৈরাগী নয় বলে। পারিপার্শ্বিক সহস্র প্রলোভনের সঙ্গে যাদের নিত্য দ্বন্দ্ব করতে হয়, দেহ ও মনের

অসংখ্য দুর্ব্বলতা প্রায়ই তাদের ললাটে পরাজয়ের কলঙ্ক-রেখাই এঁকে দিয়ে যায়! তা বলে তুমি যেন মনে কোর না যে, আমরা সবাই এম্‌নি দুর্ব্বল!"

"তোমাকে যে দেখেছে, সে কোনও দিনই ও কথা মনে করতে পারবে না কমলা!"

"আচ্ছা, ও সব বাজে কথা থাক্। এখন আমি তোমায় একটা অনুরোধ করতে চাই, রাখ্‌বে কি?"

"সে কথা জিজ্ঞেস করবার তো কোনও প্রয়োজন নেই, শুধু আদেশের অপেক্ষা মাত্র।"

"তাই না কি? বেশ তা'হ'লে আমার গা ছুঁয়ে দিব্যি কর' যে, হাজার দোষে দুষী হ'লেও লীলাকে কোনও দিন ত্যাগ করবে না। সে এখনও নিতান্ত বালিকা, অটল ধৈর্য্যের সঙ্গে তাকে সংসার স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে হবে,—তবে সে এক দিন তোমার জীবনের কোনও নির্ম্মল প্রভাতে সর্ব্বসন্তাপহরা প্রেমের শান্ত স্নিগ্ধ ছায়াময় নিভৃত উপকূল দিয়ে মহিমময়ী নারীত্বের গৌরব-শিখরে পৌঁছতে পারবে!"

"এর জন্যে আর বিশেষ ক'রে অনুরোধ কেন কমলা! তুমি কি জানো না—তার জন্যে আমি কি না করছি, কতখানি সহ্য ক'রে আছি?"

"সে কথা জানি বলেই তো আরও আমি তোমাকে একটা

বন্ধনের মধ্যে বেঁধে রেখে যেতে চাই, নইলে বিদেশে গিয়েও যে আমি শান্তি পাব না। তোমার মত প্রকৃতির লোকেরা যখন বেঁকে দাঁড়ায়, তখন কিছুতেই কোনও প্রলোভনেই আর তাদের উল্টো দিকে নোয়ানো যায় না। তাই ভয় হয়, পাছে অধীর হ'য়ে তুমি কোনও দিন লীলার দিক থেকে বুঝি বা তোমার মুখ ফিরিয়ে নেবে! তোমার কাছ থেকে সে বিষয়ের একটা নিশ্চিত আশ্বাস না পেলে আমি যে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বেরুতে পারবো না!—অথচ আমাকে যেতেই হবে, এই বেলা—এই সুযোগে। এখন যদি বেরিয়ে পড়তে না পারি, তাহ'লে হয় ত চিরকালের মতো জড়িয়ে পড়বো সংসারের পাঁকে—জীবনে আর কখন বোধ হয় তফাৎ হ'তে পারবো না!"

"আমার মুখ থেকে সে কথা শুনলেই যদি তুমি নিশ্চিন্ত হও, তাহ'লে যাও তুমি, কমলা, নিশ্চিন্ত হয়েই তোমার জীবনের ব্রত উদ্‌যাপন করগে। লীলার জন্যে কোনও ভয় নেই, তাকে আমি জীবনে কখনও দুঃখ দেবো না—এই তোমার গা ছুঁয়ে শপথ করছি।" বলিতে বলিতে নরেশ সাগ্রহে কমলার একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে মুঠা করিয়া ধরিল। কি জানি কেন—কমলা আজ আর তাহার হাত সরাইয়া লইবার কোনও চেষ্টাই করিল না। হাসি মুখে যেন বিশেষ প্রীত হইয়াই বলিল, "কিন্তু আমি তো তোমাদের বনিবনাও না দেখে যেতে পারছি নি নরেশদা! আমরা তিন জনেই যে অসুখী হ'য়ে থাকবো, এ আমি কিছুতেই

হ'তে দিচ্ছি নি ! আমি যদিও ঠিক অসুখী নই, কিন্তু তোমাদের অসুখী দেখ্‌লে তো আমি কোথাও গিয়ে এক দিনের জন্যেও স্বোয়াস্তি পাবো না। অথচ এই বেলা পালাতে না পারলেও কিন্তু আমার মুক্তি নেই।"

"বেশ তো, কি করলে তুমি নিশ্চিন্ত হও বল।"

ব্যাকুল মিনতির সহিত কমলা বলিল, "তুমি বাড়ীতে থাকো—লক্ষ্মী ভাইটী আমার,—তাঁরা আসছেন ব'লে কোথাও পালিও না। নিজে থেকে তাঁদের খাতির যত্ন কর। লীলার সঙ্গে আজ থেকে এমন ব্যবহার কর, যেন তোমাদের মধ্যে কোনও দিনই কোনও মনোমালিন্য ছিল না। তাহ'লে নিশ্চয় দেখো, লীলাও তার বাপ মার কাছে কিছু ভাঙ্‌বে না।"

"সে বিষয়ে তুমি এতটা নিশ্চয় হচ্ছ কি ক'রে ?"

"কারণ, আমিই যে সেটা তার পক্ষে আজ অসম্ভব ক'রে তুলিছি।"

"কি রকম ?"

"অনেক দিন আগে তুমি একবার আমাকে এই কাজটাই যে ভাবে করবার জন্যে অনুরোধ করেছিলে, আমি তখন তোমার কাছে সেটা করতে অস্বীকৃত হলেও, কাজটা আমার চেষ্টাতেই আজ সম্পূর্ণ হয়েছে, কিন্তু ঠিক সে ভাবে নয় ! আমি একটু উল্টো পথ ধরে চ'লে, সোজা দিকটাই বেছে নিয়েছি !"

"তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবার প্রথম দিন থেকেই কি এই রকম উল্টো পথ ধরে চলেছো কমলা ?"

"না ভাই, তখন ঠিক সিধে পথ ধরেই এগিয়ে যাচ্ছিলুম ; কিন্তু অল্প দূর যেতে না যেতেই পথ হারিয়ে ফেলেছি। তা সে দিনের কথা আজ ভুলে যাও নরেশদা। সেদিন আমরা কেউই পথ চিন্‌তে পারিনি। তা ছাড়া অন্য কারণও যে অনেক ছিল ভাই। এখন যে পথে এতটা চলে এসেছি, সে সোজাই হোক আর বাঁকাই হোক্, এগিয়ে যেতে হবে। এখন আর পিছনে তাকিয়ে কোনও ফল নেই,—শুধু আপশোষ হ'বে, বুঝলে ?"

নরেশ কমলার হাতখানা আরও জোরে চাপিয়া ধরিয়া গদগদ কণ্ঠে বলিতে লাগিল—"কমলা, তুই যে আমার চেয়ে কত উঁচুতে চলে গেছিস, তোর প্রাণটা যে কত বড়, আজ তার অনাবৃত মূর্ত্তি দেখে বিস্ময়ে পুলকে শ্রদ্ধায় তোর কাছে আমার মাথা নত হ'য়ে পড়ছে! আজ যেন সমস্ত অন্তরের মধ্যে অনুভব করতে পারছি—কী ভুলই সেদিন করেছিলুম আমরা! আমরা যা চাই—আমার মন, আমার প্রাণ, আমার অন্তরাত্মা যা পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তোরই ভেতর তারা যেন সবাই একসঙ্গে ভিড় ক'রে লুকিয়ে রয়েছে!—আমার সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি যেন তোরই ওই অন্তরনিঃসৃত অনন্ত-সুধা-সিঞ্চিত স্নেহধারার মধ্যে আজন্মকাল নিহিত রয়েছে! আজ

যেন আমি প্রথম ঘুম ভেঙে উঠে, আমারই মাথার শিয়রে আমার চিরদিনের ঈপ্সিত কামনার ধন—"

হঠাৎ শিহরিয়া উঠিয়া, সজোরে হাতটা ছিনাইয়া লইয়া কমলা বলিয়া উঠিল, "শীগ্‌গির যাও তুমি—ঐ বোধ হয় তাঁরা এলেন, বাড়ীর সাম্‌নে যেন গাড়ী দাঁড়াবার শব্দ পেলুম !"

নরেশও চমকাইয়া উঠিয়া বলিল, "এ্যাঁ !—এসে পড়েছেন না কি ? তাই তো ! কি হবে— তা হ'লে—"

অধীর হইয়া কমলা বলিল—"যাও, যাও,—এখনি ছুটে গিয়ে —তাঁদের খাতির করে গাড়ী থেকে নামিয়ে নিয়ে এসগে—ওই বোধ হয় লীলা নেমে যাচ্ছে—যাও চট্ করে—ওর সঙ্গে গিয়ে দু'জনে হাসি মুখে খুসী হয়ে ওঁদের তুলে নিয়ে এসো—"

নরেশ তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল। পিছন হইতে কমলা আবার বলিয়া দিল, "ষ্টেসনে ওঁদের নিজে আনতে যেতে পারোনি ব'লে একটা কিছু সঙ্গত কারণ দেখিও, বুঝলে ?

সিঁড়ির সব-শেষ ধাপ হইতে নরেশ উত্তর দিল "আচ্ছা।"

কমলা তখন ঘরের ভিতরের একখানা কৌচের উপর অবসন্নের মত বসিয়া পড়িয়া বলিল, "যাক্—বড্ড সময়ে ওঁরা এসে পড়েছেন !" কমলার সর্ব্বশরীর তখনও কাঁপিতেছিল ; কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার উঠিয়া পড়িয়া, প্রায় ছুটিতে ছুটিতে সেও নীচে নামিয়া গেল।

নরেশ ও লীলা যখন কর্ত্তা-গিন্নীকে গাড়ী হইতে নামাইয়া আনিল, কমলা তখন বাহিরের দরজায় আসিয়া পৌছিয়াছে। তাহারা প্রবেশ করিবামাত্র, সে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া, তাঁহাদের পায়ের ধূলা মাথায় লইল। গৃহিণী হাত বাড়াইয়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া, সেই হাত আবার আপন ওষ্ঠে স্পর্শ করিয়া, একটা অস্পষ্ট চুম্বনের ধ্বনি করিলেন। আমাদের ছেলেমেয়েরা শৈশব অতিক্রম করিলেই জননী ও জননী-স্থানীয়াদের নিকট হইতে মায়ের সে গালভরা স্নেহ-চুম্বন লাভে বঞ্চিত হয়। তখন হইতে জননীদের সে অকৃত্রিম স্নেহ-সম্ভাষণের এই একটুখানি-মাত্র শুষ্ক বিশ্রী অভিনয় পাইয়াই তাহাদের সন্তুষ্ট থাকিতে হয়!

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন আছ বৌমা? বড্ড রোগা দেখছি যে!"

কমলা প্রণামান্তে উঠিয়া মাথার ও গায়ের কাপড়টা টানিয়া-টুনিয়া ঠিক করিতে করিতে হাসিমুখে বলিল, "বেশ আছি মা, রোগা কোথায়! ঠাকুরঝির আদর-যত্নে বরং গায়ে একটু গত্যি লেগেছে বলুন।"

নরেশ ব্যস্ত হইয়া বলিল, "আগে চল বৌদি, এঁদের ভিতরে নিয়ে গিয়ে বসাই গে। তার পর কথাবার্ত্তা হবে'খন।"

কমলা বলিল, "তোমরা নিয়ে চল ভাই,—আমি ততক্ষণ ওঁদের চা আর জলখাবারটা গুছিয়ে নিয়ে আসি—"বলিয়া কমলা অন্য দিকে চলিয়া গেল।

ড্রয়িং-রুমের বড় ইজিচেয়ারখানিতে শ্বশুরকে খাতির করিয়া বসাইয়া নরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "গাড়ীতে আপনাদের কোনও কষ্ট হয় নি ত?"

"না, বেশ একখানি খালি গাড়ী পেয়েছিলুম।"

"মাকে যেন বড় দুর্ব্বল দেখছি!—ওঁর কাসিটা কি এখনও সারেনি?"

"না, একেবারে সারেনি, এখনও একটু আছে। তবে সে অতি সামান্য। তবু আমি ওকে খুব সাবধানে চ'খে চ'খে রেখেছি,—একটুও ঠাণ্ডা লাগাতে দিইনি। তোমরা বেশ ভালো আছো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনাদের আশীর্ব্বাদে কেটে যাচ্ছে একরকম।"

গৃহিণী এতক্ষণ ঘরের চারিদিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিলেন। তাড়াতাড়ি কর্ত্তাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওগো, দেখছ একবার জামায়ের কাণ্ডকারখানা?"

কর্ত্তা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন "না,—কি বল' ত?"

"একবার ঘরখানার চারদিকে চোখ চেয়েই দেখ না,—এ যেন আমরা আবার আমাদের নিজের বাড়ীতেই এসে বসিছি বলে মনে হচ্ছে!"

কর্ত্তা এবার ভাল করিয়া চারিদিকে দেখিয়া বলিলেন, "তাই তো! এ যে ঠিক অবিকল আমাদের ড্রয়িং-রুমের মতনই সাজানো দেখছি! মেঝেয় সেই রকমই কার্পেট পাতা—জান্‌লা দরজায় সেই ধরণেরই পর্দ্দা দেওয়া। সেই রকমেরই টেবিল, চেয়ার, আর্শী, ফুলদান, কৌচ, কেদারা! আবার ঠিক তেমনি করে সাজানও রয়েছে দেখ্‌ছি! দেয়ালের গায়ে ছবিগুলো পর্য্যন্তও যে একই রকমের!"

"তবে আর বল্‌ছি কি,—আমাদের বাড়ীর যেখানকার যেটি সেখানকার সেটি এখানে একেবারে ঠিক হুবহু বজায়!" বলিতে বলিতে গৃহিণী নরেশের নিকট উঠিয়া আসিয়া সস্নেহে বলিলেন, "বেঁচে থাকো বাবা, রাজা হও; তুমি যে আমাদের লিলিকে সুখী করবার জন্যে এতটা করেছো, এ দেখে আজ বড় খুসি হলুম।"

কর্ত্তাও প্রীত হইয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, ছোক্‌রার বাহাদুরী আছে বটে! খুঁজে খুঁজে সব যোগাড় করেছে তো ঠিক্! ওকে তারিফ্ করা উচিত।"

গৃহিণী এবার কন্যার দিকে ফিরিয়া কৃত্রিম কোপের সহিত

বলিলেন, "লিলি! তুই কি নেমখারাম মেয়ে বল্ তো? একখানা চিঠিতেও কি লিখতে নেই—যে ঘরবাড়ী তোর এমন মনের মতো ক'রে জামাই আমার সাজিয়ে দিয়েছে!"

লীলা হাসিতে হাসিতে বলিল, "বাঃ, আগে লিখ্‌লে কি আর এমন মজা হোতো?"

"বটে! তোর পেটে পেটে এত দুষ্টুমী? এক বছরেই যে বেশ সেয়ানা হ'য়ে উঠেছিস্ দেখছি!" বলিয়া গৃহিণী কন্যার চিবুকটি ধরিয়া নাড়িয়া দিলেন।

কমলা চায়ের সরঞ্জাম ও জলখাবার হাতে করিয়া ঘরে ঢুকিল। গৃহিণীর কথাবার্ত্তা সে বাহির হইতে শুনিতে পাইয়াছিল, তাই ভিতরে আসিয়াই বলিল, "শুধু কি এই একখানা ঘর মা? সমস্ত বাড়ীখানা ও ঠিক আমাদের সে বাড়ীর মতো ক'রে সাজিয়েছে, পাছে লীলার নতুন যায়গায় এসে কোনও কষ্ট হয়। কী ভালোই যে বাসে ও আমাদের লিলিকে তা আর কি বল্‌বো!"

গৃহিণী একগাল হাসিয়া বলিলেন "বটে! তবে তো ভালো!"

কর্ত্তাও হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "দেখো, আমি তোমার জামায়ের বুদ্ধিরও যথেষ্ট প্রশংসা না ক'রে থাকৃতে পারছিনি। নববিবাহিতা পত্নীকে সুখে রাখবার জন্যে এর চেয়ে ভালো উপায় বোধ হয় আজ পর্য্যন্ত আর কেউ আবিষ্কার করেনি!"

গৃহিণী বলিলেন, "আমি শুধু ভাব্‌ছি—মেয়েটা কি দুষ্টু!

রোজ চিঠি দিতো, কিন্তু এক দিনও এ খবরটা ছায়নি গা! যা হোক্ মেয়েটার বরাত ভালো বলতে হবে। এমন স্বামী যার সে যথার্থই সৌভাগ্যবতী। নিজের চেষ্টায় নিজের উপার্জ্জনে যে স্বামী তার স্ত্রীর জন্যে এতটা করে, সে স্ত্রীর গৌরব বোধ করবার কথা। আশীর্ব্বাদ করি মা—স্বামীর এই রকম অনুরাগ যেন তুই আজীবন অটুট রেখে চলতে পারিস!"

কমলা বলিল, "তা ও পারবে মা,—মেয়েটি আপনার ভারি চালাক চতুর হ'য়ে উঠেছে!"

"কিন্তু চিঠিতে ওর এ বিষয়টা আমাদের লেখা উচিত ছিল তো!—তা নয়, ইদানিং ওর চিঠিতে থাক্‌তো কেবল যত আগ্‌ড়োম-বাগ্‌ড়োম আধ্যাত্মিক তত্ত্ব কথার অনুশীলন—"

লীলা ছুটিয়া আসিয়া জননীর মুখে হাত চাপা দিয়া বলিল, "মা!"—চখের কোণে তাহার সুস্পষ্ট নিষেধের মিনতি!

গৃহিণী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "জামাই যেমন তোকে সুখী করবার জন্যে এতটা করেছে, তুইও যদি তেমনি এখন ওসব ছাই-ভস্ম আধ্যাত্মিক আলোচনা ছেড়ে তাকে সুখী করবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করিস্ খুকী, তবেই তোদের দু'জনের ভালবাসা অক্ষয় হয়ে থাক্‌বে—বুঝ্‌লি!"

"ফের যদি তুমি ও সব কথা কইবে, তা হ'লে এখুনি আমি

এখান থেকে উঠে যাবো কিন্তু!" বলিয়া লীলা তাহার মুখখানি ভার করিয়া বসিল।

গৃহিণী আরও হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, "কেন কি আর দোষের কথাটা বলিছি আমি? আমার জামায়ের একটু সুখ্যাতি করিছি বই তো নয়! তুমি চিঠিতে তার কথা কিছুই আমাদের লিখ্‌তে না তা বল্‌বো না আমি?"

"ছিঃ, তোমার কি ভীমরতি ধরেছে? এখানে বাবা রয়েছেন না? আর তো কখনো তোমাকে আমি চিঠি লিখ্‌বো না, দেখো দিখিনি!"

কমলা এক একটি করিয়া সকলের হাতে চায়ের পেয়ালা তুলিয়া দিয়া বলিল, "ভাগ্যিস তোমরা এলে মা, তাই তো স্বচক্ষে এ সব দেখে চক্ষু সার্থক করলে!"

"আসা কি আর হোতো বৌমা! যে ক'রে এসেছি তা আমিই জানি! তোমার শ্বশুর তো কিছুতেই জামাই-বাড়ী আস্‌তে চাননা। অনেক সাধ্য-সাধনা ক'রে তবে ওঁকে রাজি করিয়েছি! বলি, হ্যাঁগা, দেশ-ভ্রমণ করতে বেরিয়েছি, মানুষের শরীর গতিক তো বলা যায় না! আর ফিরি কি না ফিরি, একবার মেয়ে জামাইকে না দেখে যেতে পারি কি? ওই একটা শিবরাত্রির শল্‌তে এখনও মিট্ মিট্ করছে বইতো নয়,—আর সবগুলোকেই তো রাক্ষুসীর মত পেটে পূরিছি।" বলিতে বলিতে গৃহিণী আঁচল দিয়া চোখ মুছিলেন।

কর্ত্তা চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে বলিলেন "বাস্তবিকই আজ এখানে এসে আমরা বড় আনন্দ পেলুম। আমি আস্‌তে চাই নি কিছুতেই, লীলার মা একরকম জোর করেই আমাকে এখানে টেনে নিয়ে এসেছে। এখন মনে হচ্ছে ভাগ্যে এসেছিলুম, নইলে এ আনন্দটুকু থেকে তো আমাকে বঞ্চিত হ'তে হোতো। এখানে আস্‌বার আগের মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমার ধারণা ছিল যে, লীলা যতই কেন লিখুক না সে ভালো আছে আর সুখে আছে, —নিশ্চয়ই সে এখানে কষ্ট পাচ্ছে! কেন না লীলাকে নিয়ে আস্‌বার সময় নরেশের যে রকম জেদ্ আর একগুঁয়েমি দেখে-ছিলুম, তাতে আমার ধারণা হ'য়েছিল যে, সে নিশ্চয় মেয়েটাকে নিয়ে গিয়ে তার অশেষ দুর্গতি করবে। তাই সঠিক খবর জানবার জন্যে কমলাকে আমি পত্র দিই। সে লিখেছিল বটে যে, তোমরা বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আছো, কিন্তু হঠাৎ একদিন ঝুপ্ করে এসে দেখে যাবার জন্যেও বিশেষ ক'রে অনুরোধ করেছিল! আমরাও তাই খুব শেষ মুহূর্ত্তে তোমাদের সংবাদ দিয়ে একেবারে চিঠির সঙ্গে সঙ্গেই এসে হাজির হয়েছি! কিন্তু এসে আমাদের দুঃখিত হওয়া দূরে থাক্, আমরা আশাতিরিক্ত সুখী হয়েছি! বিশেষ ক'রে আজ নরেশ, তোমার মহৎ হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে আমি ধন্য হলুম। তোমার ওপর আমার যে অন্যায় সন্দেহ ছিল, আজ তা শুধু দূর হ'য়ে যাওয়া নয়,—উপযুক্ত পাত্রে কন্যাদান করিছি

জেনে আমি আজ একটা তৃপ্তি ও গর্ব্ব অনুভব করছি!” বলিতে বলিতে কর্ত্তা উঠিয়া দাঁড়াইয়া নরেশের সহিত ইংরাজি ধরণে বেশ হৃদ্যতার সহিত করমর্দ্দন করিলেন।

শ্বশুর ও জামাতার মধ্যে সম্প্রতি যে অপ্রিয় মনান্তরের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহারই ঘন মেঘ অপসারিত হইয়া উভয়ের মধ্যে সদ্ভাব ও প্রীতির পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইতে দেখিয়া, আনন্দে গদগদ কণ্ঠে গৃহিণী বলিলেন, “এইবার আমার একটী অনুরোধ তোমাকে রাখ্‌তে হবে বাবা! তুমি আমার এই একগুঁয়ে বদ্‌-মেজাজি বোকা মেয়েটিকে তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও জোর ক’রে আমাদের ওখান থেকে নিয়ে আস্‌বার পর, সে তোমার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করেছিল, আমি সেটী সব শুন্‌তে চাই!”

শঙ্কা ও সরমে অপ্রতিভ লীলা জননীর দিকে কাতর দৃষ্টি ফিরাইয়া মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে ডাকিল, “মা!”

হাসিতে হাসিতে গৃহিণী বলিলেন, “তুই যেমন আমাদের সব খবর দিস্‌নি, তেমনি তোকে আমরা আজ জব্দ করবো। জামায়ের কাছ থেকে আজ তোমার গুণের কথা সব একটি একটি করে শুনবো। বল’তো বাবা!”

নরেশ একবার চকিতের ন্যায় লীলাকে দেখিয়া লইয়া, কমলার মুখের পানে বিপন্নের মতো চাহিয়া রহিল। নিরুপায় নরেশের চোখের সে অসহায় করুণ দৃষ্টি দেখিয়া কমলা তৎক্ষণাৎ তাহার

মনের অবস্থা বুঝিতে পারিল; এবং আঁখির ইঙ্গিতে নরেশকে যা হোক্ কিছু গুছাইয়া বলিবার জন্য ইসারা করিয়া কমলা বলিল, "নাও তাহ'লে কথক-ঠাকুর, তোমার মহাভারত সুরু কর, আমি ততক্ষণ এঁদের নাওয়া খাওয়ার ব্যবস্থা করিগে, বেলা হ'য়ে যাচ্ছে" বলিতে বলিতে কমলা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। লীলাও তাহার পিছু পিছু উঠিয়া পলাইতেছিল, কর্ত্তা তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন, "তা হচ্ছে না খুকী, এইখানে তোমাকে ব'সে থাক্‌তে হবে! যেমন বাপমার কাছে ভাল খবরগুলি লুকিয়ে রেখেছিলে, তেম্‌নি এই তোমার শাস্তি! বল'তো নরেশ, বেটীর দুষ্টুমীগুলি সব খুঁটিয়ে,—কিছু বাদ দিয়ো না।"

গৃহিণী বলিলেন, "দেখো বাছা, দোষ বল্‌তে ব'সে যেন গুণ গাইতে সুরু করো না।"

নরেশ সকৌতুক মৃদুহাস্যে লীলার দিকে চাহিয়া গৃহিণীকে বলিল, "কিন্তু মা, যার কথা বল্‌বো, তার যদি এতে আপত্তি থাকে, তাহ'লে কি ক'রে সব কথা বলা চল্‌বে?"

"ওর আপত্তি শুন্‌ছে কে? তুমি নির্ভয়ে বলে যাও।"

লীলা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বিড় বিড় করিয়া বলিতেছিল, "যে বল্‌বে সে আমার মরা মুখ দেখবে—তার অতি বড়—"

গৃহিণী তাহার মুখে হাত চাপা দিয়া বলিলেন, "তবে রে দুষ্টু মেয়ে! রোস্ তো! ফের যদি ওকে দিব্যি-দিলেসা

দিবি—তা'হলে কিন্তু তোর বাড়ীতে আমরা আর একদণ্ডও থাক্‌বো না।"

নরেশ বলিল, "দেখুন মা, আমি সব বল্‌তে রাজি আছি; কিন্তু এই কড়ারে যে, আমার যদি কোথাও কিছু বল্‌তে ভুল হয়, তা হ'লে ওকে সেটা শুধ্‌রে নিতে হবে!"

কর্ত্তা বলিলেন, "নিশ্চয়! এ বেটীকে এখানে ধরে রাখলুমই ত সেই জন্যে; তোমার ভুল সব ও ধরিয়ে দেবে।"

গৃহিণী বলিলেন, "হ্যাঁ, তা'হলে, তোমাকে আর আমাদের জেরা ক'র্‌তে হবে না।"

নরেশ বলিল "বেশ, তা'হলে সব বলি শুনুন। কিন্তু বলবার আগে আমি আপনাদের কাছে একটা বিষয়ের জন্য ক্ষমা চেয়ে রাখি, সেটা হ'চ্ছে, আমাদের এই দাম্পত্য কলহের কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে যে নির্লজ্জতাটুকু প্রকাশ হ'য়ে পড়বে তারই জন্য!"

নরেশের ভনিতা শুনে কর্ত্তা গিন্নী দুইজনেই বলিয়া উঠিলেন "সে জন্যে আমরা তোমাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করছি! তুমি কোনও কথা বল্‌তে একটুও লজ্জা কোর না, বুঝলে—"

নরেশ বলিতে লাগিল, "আপনাদের ওখান থেকে তো রাগা-রাগি ক'রে ওকে নিয়ে আসা হোলো ব'লে গাড়ীতে পা দিয়েই ও আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বস্‌লো। সেদিন থেকে ও এক রকম আমার মুখ দেখাই বন্ধ করে দিলে। দিনরাত কান্নাকাটি,

ঝগ্‌ড়াঝাঁটি, রাগারাগি। ভাগ্যে বৌদি বুদ্ধি ক'রে সঙ্গে এসেছিলেন তাই রক্ষে! তিনি ওকে কত ভুলিয়ে-ভালিয়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করলেন—তবে ও খেতে দেতে সুরু করলে, নইলে—আমার এখানে ও জলস্পর্শ করবে না বলেছিল! ভারি মুস্কিলে পড়েছিলুম, বুঝলেন,—সেই বোমার দলের ছেলেদের জেলের ভিতর না খাওয়ার ধর্ম্মঘট গোছ ক'রে তুলেছিল আর কি!"

নরেশের এই কথায় সকলে খুব হাসিয়া উঠিলেন। নরেশ বলিতে লাগিল, "ঝোঁকের ওপর ওকে এখানে এনে ফেলে তার পর কিন্তু আমার মনে ভারি অনুতাপ হ'তে লাগল! ওর সেই অসহায় কাতর অবস্থাটা যতই ভাবতে লাগলুম, ততই আমার নিজের হঠকারিতাটাকে একটা অমানুষিক নিষ্ঠুরতা বলে মনে হতে লাগ্‌লো! সত্যি কথা বল্‌তে কি, ওর তখনকার সেই ভীষণ মনের অবস্থা দেখে আমার প্রাণের ভিতর কেমন যেন একটা আতঙ্ক হয়েছিল! আমি তখন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলুম যে, যেমন ক'রে পারি আমি আমার এই অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করবো! ওর মুখে হাসি দেখে তবে আমার অন্য কাজ! প্রথমেই আমার চেষ্টা হ'ল যে, আজন্ম ও যেখানে লালিত, পালিত, বর্দ্ধিত হয়েছে, ওকে যে আজ সে বাড়ী থেকে অন্য এক যায়গায় আনা হয়েছে, এইটে ওকে আগে ভোলাতে

হবে! দেখতেই পাচ্ছেন—আমার সে উদ্দেশ্য আমি কতদূর কার্য্যে পরিণত করেছি! আমার এ কাজটায় ও ভারি খুসী হোলো!—প্রথম চেষ্টাতেই অর্দ্ধেক বাজী মাৎ হলো দেখে আমার উৎসাহ আরও বেড়ে গেল! তার পর ওর বাক্স থেকে এক দিন আপনাদের ফটোগ্রাফ দু'খানা চুপি চুপি বার ক'রে নিয়ে গিয়ে আমি যেদিন এই দু'খানা বড় বড় 'অয়েল পেন্টিং' করিয়ে নিয়ে এলুম, সেদিন ওর মুখে শুধু একটা তৃপ্তির হাসিই নয়,—কৃতজ্ঞতায় ভরা দুটী চোখের দৃষ্টিতে নীরব নিবিড় ধন্যবাদ পেয়ে আমি সেদিন চরিতার্থ হয়েছিলুম! প্রথমটা দিনকতক ও আমাকে দেখলেই অন্য ঘরে সরে যেতো, আমার সামনেই থাক্‌তো না! কিন্তু তার পর থেকে ও আমার সে শাস্তিটা মাফ ক'রে দিলে, তবে কথাবার্ত্তা বলা তখনও বন্ধ রেখেছিল। কিন্তু আমার প্রতি ওর স্নেহ যত্ন আমি প্রতি দিন সহস্র রকমে অনুভব করতুম। আমার জিনিস-পত্রগুলি সমস্ত যথাস্থানে গুছিয়ে রাখা, আমার কাজকর্ম্মের টেবিলটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, আমার বইটইগুলি ঝাড়া-মোছা, দু'বেলা আমার চা, জলখাবার ইত্যাদি ঠিক আমার পছন্দ মতো তৈরি করে দেওয়া, আমার জামা কাপড় প্রতি সপ্তাহে নিয়ম মত ঠিক করে বার করে দেওয়া, এমনিই সব ছোট খাটো হাজার রকমের খুচরো কাজে নিত্য ওর সেবাপরায়ণ হাত দুখানির স্পর্শ পেয়ে ওর এই

ক্ষমাপ্রবণ কোমল হৃদয়ের অযাচিত করুণাধারায় অভিষিক্ত হতে লাগলুম !”

লীলা আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। নরেশের কথা শুনিতে শুনিতে অপরাধের অনুতাপে ও মিথ্যা প্রশংসার লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিয়া লীলা বলিল, “না গো, আমি ওসব কিছু করিনি।”

নরেশ ব্যস্ত হইয়া বলিতে লাগিল—“ওর কথা শুনবেন না—ও ভারি লাজুক। আমার সঙ্গে কথা বন্ধ ক'রে দিয়েছিল ব'লে লজ্জার খাতিরে ইচ্ছে থাকলেও কিছুতেই আগে কথা কইতে পারেনি ! যা হোক্, এই রকমে ক্রমে ক্রমে আমাদের দু'জনের মাঝখান থেকে সমস্ত দ্বন্দ্ব, সকল বিরোধ দূর হ'তে লাগলো। তার পর অবশিষ্ট অন্ধকারের কালো ছায়াটুকু অপসারিত হ'য়ে এক দিন নির্ম্মল উষার স্নিগ্ধ আলোক ভেসে এলো—মনের বনে বনে যেন বসন্তের শত সুগন্ধ ফুল ফুটে উঠলো ; পাখীর কলতান, নদীর জলগান, যেন প্রকৃতির সমস্ত শোভা-সম্পদ নিয়ে এসে আমাদের নূতন গৃহখানিকে আমোদিত করে তুললে ! আমার নিষ্ঠা, আমার সাধনা, আমার ঐকান্তিক অনুরাগ সিদ্ধির আনন্দে সার্থক হ'য়ে উঠলো। প্রতিদিনের কর্ম্মশেষে শ্রান্তকলেবরে যখন গৃহে ফিরি, দু'টী স্নেহব্যাকুল ব্যগ্র বাহুর উদ্‌গ্রীব স্পর্শ আমার সকল ক্লান্তি অপনোদন ক'রে দেয় ! কাজের ভিড়ে

রাতের পর রাত বিনিদ্র ব'সে আমি যখন কারবারের হিসেবপত্র দেখি, সারাক্ষণ আমার আশে পাশে থেকে শত প্রকারে ও আমার শ্রমলাঘবের চেষ্টায় শশব্যস্ত হ'য়ে থাকে। মাঝে মাঝে কাজের হাঙ্গামে কিছু দিনের জন্যে যখন আমি মফস্বলে যাই, ওর অনুরাগ-সিঞ্চিত দীর্ঘ সুন্দর পত্রগুলি আমার প্রবাসের সকল ক্লেশ মুছিয়ে দেয়! তার পর যখন সেই সামান্য ক'দিনের অনুপস্থিতির পর আবার গৃহে ফিরে আসি, আমার একান্ত অনুরক্ত স্ত্রী তার উদ্যত আনন্দাশ্রু গোপন করতে না পেরে বিহ্বল হয়ে ছুটে এসে গৃহদ্বার থেকে আমায় অভ্যর্থনা করে নিয়ে যায়! যেন কত দিনের পর সেই আমাদের প্রথম দেখা!"

গৃহিণী এক গাল হাসিয়া কর্ত্তাকে বলিলেন—"শুনছো গা! —খুকী আমাদের একেবারে পাকা গিন্নীটি হ'য়ে উঠেছে!"

হাসিতে হাসিতে কমলা ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "সে আর বলবেন না মা! ওর গিন্নীপনার জ্বালায় লোকজন চাকর-বামুন সবাই তটস্থ! বাড়ীর কর্ত্তা থেকে আরম্ভ ক'রে পোষা কুকুরটির ওপোর পর্য্যন্ত ওর অপ্রতিহত প্রভাব! ও যে এত শীগ্‌গির এমন একজন কাজের লোক হ'য়ে উঠ্‌বে, এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি!"

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন—"হ্যাঁ নরেশ! পোড়ারমুখী কত দিন বাদে তোমার সঙ্গে কথা কইলে—বল' তো?"

নরেশ হাসিতে হাসিতে বলিল, "তা আমার ঠিক মনে নেই ; তবে সেই রূপকথার গল্পের মতো আমার সে দিন মনে হয়েছিল—যেন সে কত যুগযুগান্তরের পর বিজন রাজপুরীর এক পাষাণ-প্রতিমা হঠাৎ যাদু-মন্ত্রে সজীব হ'য়ে উঠ্‌লো !"

"তাহ'লে তোমাদের মিটমাট হ'তে দস্তুরমত সময় লেগেছিল দেখ্‌ছি !"

"অন্ততঃ আমার তো তাই মনে হ'য়েছিল, কি বল বৌদি ?"

"আর খুকী পোড়ারমুখী কি না এ কথার এক বর্ণও আমাদের জানায় নি। কি দুষ্টু গা ! এমন মুখ-টেপা মেয়ে তো আমি কখন দেখিনি ?"

"না মা, সে জন্যে ওর কোনও দোষ ধরবেন না। বরং ও যে কেন আপনাদের সে সব কথা কিছু লেখেনি, তা যদি শোনেন, তা হ'লে ওকে ক্ষমা না ক'রে থাকৃতে পারবেন না ! পাছে আমাদের সেই অস্থায়ী মনোমালিন্য—যা ও নিশ্চয় জান্‌তো যে এক দিন ন এক দিন মিটে যাবেই,—সে অপ্রিয় সংবাদ শুনে অকারণ আপনারা কেন কষ্ট পান এই ভেবে অসীম বুদ্ধিমতী এই মেয়েটি আপনাদের সে কথা কিছু লেখেনি। তা ছাড়া একেই আপনাদের অবাধ্য হওয়ায় সেদিন আপনারা আমার উপর বিশেষ ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন ; সেই সঙ্গে আবার ঐ রকম দুঃসংবাদ পেলে আপনারা হয়ত' আমার ওপোর একেবারে খড়্গহস্ত হ'য়ে

উঠতেন! তাই আমাকে বাঁচাবার জন্যেই ও আরো বিশেষ করে সে কথা আপনাদের কিছু জানতে দেয়নি। সেইখানেই তো আমি ওর অন্তরের প্রকৃত পরিচয় পেয়েছি! তার পর থেকে শত প্রকারে ও আমাকে অপরিশোধনীয় ঋণজালে আবদ্ধ করে ফেলেছে! এক দিন যখন আমাদের পরস্পরের বিরূপ মনোভাব চরম অবস্থায় এসে পৌঁছেছিল, সে দিন আমরা দু'জনেই একখানা নব-প্রকাশিত উপন্যাস প'ড়ে আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে উভয়েই শঙ্কিত হ'য়ে, পরস্পরকে সভয়ে অবলম্বন করবার জন্যে ব্যাকুল হ'য়ে উঠি! সেদিন একটী বিমুখ অন্তর আর একটি উন্মুখ চিত্তের অন্তর্মুখীন হ'য়ে অনন্ত কালের জন্যে একত্র সম্মিলিত হয়ে গেছে! আপনারা আজ সর্ব্বান্তঃকরণে তাদের আর একবার আশীর্ব্বাদ করুন, যেন তারা আর কোনও দিন এমনতর পথহারা না হয়!"

কর্ত্তা, লীলার লজ্জাবনত মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন, "নরেশের কিছু ভুল ধরতে পারলিনি খুকী?—ও কি সব ঠিক ঠাক বলতে পেরেছে?"

লীলা ঘাড় নাড়িয়া অস্পষ্ট জড়িত কণ্ঠে বলিল "উহুঁ!"

গৃহিণী উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, "কি ভুল করেছে রে জামাই? বল্ তো! দে তো ছোক্‌রাকে ধরিয়ে!"

লীলা সরমে রাঙা হইয়া উঠিয়া বলিল, "বৌদি সব জানে। বৌদিকে বলতে বল না।"

"না,—আমরা তোর কাছে শুন্‌বো।"

লীলা আরও খানিকটা ইতস্ততঃ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল—"কেন যে জানিনি, কিসের একটা আকর্ষণ আমাকে বাড়ীর দিকে এমন ক'রে টেনে রেখেছিল যে কিছুতেই সেদিক থেকে আমার মনটাকে ফিরিয়ে নিয়ে আমার নিজের ঘর-সংসারের ওপোর প্রতিষ্ঠিত করতে পারছিলুম না! স্বামীর সকল চেষ্টা, সকল যত্ন ব্যর্থ ক'রে দিয়ে, তাঁর অযাচিত অগাধ ভালবাসাকেও অবহেলা ক'রে, তাঁর অপরিসীম স্নেহ ও ধৈর্য্যকে তুচ্ছ ক'রে, আমার সমস্ত দেহ-মন শৈশবের সেই গত দিনগুলির জন্যে হাহাকার ক'রে ফিরতো! ছেলেবেলার সেই চিরপরিচিত আবাস-ভূমিটি ছেড়ে এসে নীড়চ্যুত পক্ষিণীর মতো আমার অন্তর এখানে কাতর হয়ে ছট্‌ফট্‌ করতে লাগ্‌ল!—আমি যে তখনও পর্য্যন্ত পিতামাতার স্নেহপালিতা দুহিতা হয়েই থাক্‌তে চেয়েছিলেম—আমি যে এখন একজনের পত্নী, স্বামীর অজস্র আদর সোহাগ, রমণী জীবনের যা চিরবাঞ্ছিত সম্পদ—আমি যে আজ সেই অমূল্য ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী, নারীর মর্য্যাদার সেই গৌরব-শিখরে দাঁড়িয়েও নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার দোষে আমি অনেক দিন সে সম্মান গ্রহণ করতে পারি নি! স্বেচ্ছায় নিজেকে তা' থেকে বঞ্চিত ক'রে রেখে আমার দেবতুল্য স্বামীর শুধু অপমান নয়—প্রতি দিন তাঁর নির্য্যাতনও করেছি! তার পর হঠাৎ এক দিন

আমার চারিদিকে চেয়ে দেখলাম্ আমি আর শুধু পিতামাতার স্নেহরসে পরিপুষ্ট হতে পারছি নি! তাঁদের আদর যত্নে আমার স্নেহের ক্ষুধার তৃপ্তি হ'লেও অন্তরের হাহাকার নিবৃত্তি পায় না। বুঝ্‌তে পারলুম, অতীত জীবনকে অতিক্রম করে আমি এখন নূতন রাজ্যে উপস্থিত হয়েছি! এখানে তো আর নিশ্চেষ্ট হ'য়ে বসে থাক্‌লে চল্‌বে না! তাহ'লে যে শুকিয়ে ঝ'রে ধূলায় প'ড়ে নিষ্পেষিত হতে হবে। জীবন চাই!—নবরাজ্য অধিকার করতে হবে, অনেক বিলম্ব ক'রে ফেলিছি, আর দেরী হ'য়ে গেলে হয়ত সব হারাবো! ভয় হ'ল এ আমি কি করছি!—হাতের মুঠোয় যে মাণিক পেয়েছি—হেলা ক'রে আজ তা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে—শেষে কি অন্যের দ্বারে গিয়ে কাঙাল ভিক্ষুকের মতো হাত পেতে দাঁড়াতে হবে?—সে তো আমি প্রাণ থাকৃতে পারবো না! সেদিন সেই স্মরণীয় মুহূর্ত্তে আমার দুর্ব্বল চিত্তে নারীর অপূর্ব্ব মহিমা তার সমস্ত শক্তি নিয়ে জেগে উঠলো। আকুল আগ্রহে সে তার নির্দ্দিষ্ট জীবনকে তেম্‌নি করেই বরণ ক'রে নিলে, যেমন ক'রে বারে বারে, যুগে যুগে, অসংখ্য জন্ম-জন্মান্তরে নিয়েছিল।"

"বেশ গো বেশ! সঙ্গ দোষে দেখ্‌ছি তুমিও ঠিক ওর মতন বক্তৃতা করতে শিখেছো!" বলিয়া কমলা খুব হাসিতে লাগিল।

গৃহিণী কর্ত্তার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কে বল্‌বে যে এ

লিলি আমাদের সেই খুকী! শুনলে তো মুখ দিয়ে যেন একেবারে খৈ ফুটছে!”

কমলা বলিল “আপনাদের জামাই কিন্তু মা, এখনও কথায় কথায় বলে যে, ‘লীলা আমার এখনও তেমনিই ছেলেমানুষটি আছে’।”

নরেশ বলিয়া উঠিল, “আশীর্ব্বাদ কর বৌদি, ওর ওই শিশুর মত সারল্য নিয়ে ও যেন চিরদিন অমনি ছেলেমানুষটিই থাকে।”

তখন লীলা সরিয়া আসিয়া নরেশের কাণে কাণে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিতে লাগিল, “দেখ, আমি সত্যিই বড় নির্ব্বোধ,—তুমি তো জানই,—বৌদির মতো অতটা চালাক চতুর নই; কিন্তু তবু আমি যে তোমার ওই গভীর প্রেমের অমূল্য মর্য্যাদা কতকটা বুঝতে পেরেছি, তাতে যেন তোমার আর কোনও সন্দেহ না থাকে—”

কর্ত্তা গৃহিণীকে ডাকিয়া বলিলেন, “চুপি চুপি ওদের কি পরামর্শ হচ্ছে? আজই রাত্রে কিন্তু আমি বেরিয়ে পড়তে চাই—গাড়ী ‘রিজার্ভ’ করিয়ে এসেছি।”

নরেশ কথাটা শুনিতে পাইয়া বলিল, “সে আমি টেলিফোঁ ক’রে বাতিল ক’রে দিচ্ছি! আজকে কিছুতেই যাওয়া হবে না। এখন দিন কতক এখানে থাকতে হবে।”

“না হে, সে হবে না, অনেক ঘুরতে হবে আমাদের—এখানে

বসে সময় নষ্ট করা চলবে না। বৌমা, তোমার সব জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও,—তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবো।"

লীলা আবার নরেশের কাণে কাণে বলিল, "ওঁদের রাখবার জন্যে বেশি পীড়াপীড়ি কোরো না।"

নরেশ অবাক্ হইয়া লীলার মুখের দিকে চাহিয়া চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি! দু'দিন যে তুমি ওঁদের এখানে ধ'রে রাখতে চেয়েছিলে?"

লীলা নরেশের কাণের কাছে তাহার মুখখানি আরও সরাইয়া লইয়া গিয়া অমৃত-নিষিক্ত গোপন-কণ্ঠে বলিতে লাগিল, "আজ আমি তোমায় এই প্রথম আমার অন্তরের মধ্যে নূতন করে পেয়েছি! সেখানে আর অন্য কাউকে আমি আজ সহ্য করতে পারবো না! আজকের এ শুভক্ষণে আমি শুধু তোমাকে চাই—একাকী সম্পূর্ণ ক'রে আমার নিজের কাছটিতে!"

গৃহিণী নরেশকে ডাকিয়া বলিলেন, "পোড়ারমুখী তোমার কাণে কাণে কী কু'মন্ত্র ফোস্‌লাচ্ছে? গাড়ীটা যাতে ফেল হই তার বন্দোবস্ত করতে ব'লছে বোধ হয়! ওকে আর বিশ্বাস নেই, ও সব করতে পারে।"

লীলা তাড়াতাড়ি বলিল "না মা, তা নয়,—আমি বলছিলুম, আপনারা যদি বৌদি'কেও নিয়ে যান, তা' হ'লে আমাদের ভারি মুস্কিল হবে; বৌদির যাতে না যাওয়া হয়—তাই কর্‌তে বলছিলুম

—তা উনি বলছেন বৌদিরও নাকি বেড়াতে যাবার বড্ড ঝোঁক হয়েছে ; আপনারা যাচ্ছেন শুনে অবধি বৌদিও যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছে। তাই আপনাদের সঙ্গে বৌদিরও আজই যাবার ব্যবস্থা করে দিতে চাচ্ছেন।"

কমলা পরিহাস করিয়া বলিল, "তা তো উনি দেবেনই! এত দিন যে কেন দয়া ক'রে বৌদিকে তাড়িয়ে দেন নি—এই আমার ভাগ্যি!—কথায় বলে—

কাজের বেলায় কাজি—
কাজ ফুরুলেই পাজি!"

গৃহিণী ইহাতে আপত্তি করিয়া বলিলেন, "না বৌমা! তোমার নন্দাই সে রকম প্রকৃতির নয়। জামাই আমার খুব ভালো।"

নরেশ সুযোগ বুঝিয়া অনুযোগের কণ্ঠে বলিল "দেখুন তো মা! বৌদি কেবল আমার নিন্দে পেলে আর কিছু চায় না। শুধু শুধু কেবল আমাকে যাচ্ছেতাই বলে।"

লীলা কমলার নিকট আসিয়া দুই হাতে তাহার গলাটি জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল, "বৌদি, আমায় মাপ কর্ ভাই, কত অসদ্ব্যবহার করিছি, কত অকথা-কুকথা বলিছি, কিছু মনে করিস্‌নি ভাই! আমি তোকে চিনতে পারিনি, ওঁকেও চিন্‌তে

পারিনি—বড় ভুল করিছিলুম,—ছোট বোনের কোনও অপরাধ নিস্‌নি দিদি, আজ আমি সব বুঝতে পেরেছি—"

ঘাড় নাড়িয়া মৃদু হাসিতে হাসিতে কমলা বলিল, "উহুঁ—সব ঠিক বুঝ্‌তে পারিস্‌নি দেখ্‌ছি !"

"অন্ততঃ আমি এটুকু বুঝতে পেরেছি বৌদি, যে, তোমার দয়াতেই আমি আজ স্বামীকে ফিরে পেয়েছি,—নইলে তো আমি ওঁকে পেয়েও হারিয়েছিলুম ভাই !"

"সেটা কতকটা ঠিক কথা বটে !"

"বৌদি, তোমার ঋণ জীবনে বোধ হয় শুধ্‌তে পার্‌বো না !"

"আশীর্ব্বাদ করি চিরদিন যেন এমনিই সুখে থাকো।"

নরেশ শশব্যস্তে তাহাদের নিকট সরিয়া আসিয়া হাসিতে হাসিতে কমলাকে বলিল, "আবার ওকে শুদ্ধ নিয়ে যাবার জন্যে ফোসলাচ্ছ নাকি ? বা-রে—নিজে যেতে চাও যাও না—আবার ওকে টান্‌ছ কেন ?"

কমলা নরেশের দিকে রহস্যাবৃত ভ্রূকুটী করিয়া বলিল, "নিজে তো যাবোই, দু' দণ্ড বুঝি তোমার আর তর সইছে না ! গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেবে না কি—সেই যে বলে—

'তোমার আমার ঘর,—
আরতো সবাই পর—

তোমার যে দেখছি তাই!—আচ্ছা দাঁড়াও—সবুর কর', আগে—বেড়িয়ে ফিরে আসি—তার পর যে বইখানা লিখ্‌বো সেখানা আমার 'গরীবের মেয়েকে'ও টেক্কা দেবে!"

লীলা ও নরেশ বিদ্যুৎ চমকের মতো কাঁপিয়া উঠিয়া এক সঙ্গে বলিয়া উঠিল "গরীবের মেয়ে তোমারই লেখা বুঝি?"

"চলুন আপনারা—কাপড় চোপড় ছেড়ে স্নানটান্ সেরে নেবেন চলুন,—রান্না-বান্না সব তৈরি!—" বলিতে বলিতে—সহাস্যমুখে কমলা শ্বশুর শাশুড়ীকে সঙ্গে করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সমাপ্ত

.................................Group.
Branch.

No....................

From

To